দেশ কাল মানুষের আজ কাল পরশু

নাগরিক

দ্বিতীয় বর্ষ ❖ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ❖ ২ আগস্ট ২০২৫

➲এই সংখ্যায় থাকছে

- সরকার নির্বিকার রাহুল প্রিয়াঙ্কার প্রশ্নগুলি বারবার করতে হবে ২
- বিজেপি শাসিত রাজ্যে ভাষা সন্ত্রাস ও ভুক্তভোগী বাঙালি শ্রমজীবী মানুষ ৩
- বাঙালি হলেই সন্দেহজনক , আর বাঙালি মুসলমান হলে তো কথাই নেই ৫
- আসাম গোলাঘাটের মুসলিমদের আফগানিস্তানে চলে যেতে বললেন হিমন্ত বিশ্বশর্মা ৬
- গাজা সংকটে নির্বিকার মোদী সরকার,প্রধানমন্ত্রীকে ভারতের কণ্ঠস্বর তুলে ধরতেই হবে ; সোনিয়া গান্ধি ৭
- একটি প্রাচীন মন্দির ঘিরে যুদ্ধ থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়ার ৮
- কীভাবে ঠিক হবে দালাই লামার উত্তরসূরি ৯
- অমর শহিদ মাতঙ্গিনী হাজরা ১১
- এলোমেলো কথা : বাংলাদেশের জুলাই আন্দোলন এবং ফুকো ১২
- বাংলাদেশ কোন পথে : হা চিত্ত, হা মন কিছু স্মৃতি, কিছু বেদনা ১৩
- কলকাতার বায়ুদূষণ নিয়ে আমরা কি আদৌ চিন্তিত ১৫
- শ্রদ্ধাঞ্জলি: মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা ভি এস অচ্যুতানন্দন ১৭
  রতন থিয়াম ১৮
  আজিজুল হক ১৮
  সাংবাদিক সুমিত চক্রবর্তী ১৯
- দ্রোহের কাল ১ ২০
- নাগরিক স্মৃতিচারণা : বস্তুবাদী জ্যোতি বসু ছিলেন বাস্তববাদী জননেতা ২১
- জরুরি অবস্থার প্রেক্ষাপট ও সাম্প্রদায়িক দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার শক্তির অবস্থান ২৫

➲সম্পাদকীয়

ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভারত নীতি , দিশেহারা মোদী ও ধর্মীয় বিভাজন

ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতবর্ষ ও মোদীকে ক্রমাগত অপদস্থ করে চলেছেন। তিনি অন্তত ২৯ বার বলেছেন বাণিজ্য বন্ধ করবার ভয় দেখিয়ে তিনি ভারত ও পাকিস্তানকে যুদ্ধ বিরতি করতে বাধ্য করেছেন তারপরই ভারতীয় পণ্যের ওপর ২৫% শুল্ক বসিয়েছেন বলেছেন ভারত রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনার জন্য এরপর তিনি জরিমানা চাপাবেন। সর্বশেষ বলেছেন ভারতের ও রাশিয়ার অর্থনীতি মৃত। পাকিস্তানের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি করে ট্রাম্প বলেছেন ভবিষ্যতে ভারতকে পাকিস্তানের কাছ থেকে তেল কিনতে হবে।

ট্রাম্প পাকিস্তানের জেনারেল আসিম মুনিরকে ডেকে এনে দ্বিপ্রাহরিক ভোজন করেছেন। মোদী ভীত সন্ত্রস্ত। কোনও প্রতিবাদ করার সাহস নেই। মোদী ভারতেরজোট নিরপেক্ষ বিদেশ নীতি বিসর্জন দিয়ে 'আব কি বার ট্রাম্প সরকার' শ্লোগান দিয়েছিলেন, 'নমস্য ট্রাম্প' করেছিলেন। এরফল দেশকে ভোগ করতে হবে।

দেশের অভ্যন্তরে ধর্মীয় বিভাজন করে, অনুপ্রবেশের ধুয়ো তুলে সংখ্যালঘু, দলিত ও শ্রমজীবী মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়াই মোদী ও তাঁর দলের চিরকালের উদ্দেশ্য। এদের গুরুদেব আর.এস.এস-এর. দ্বিতীয় সর সঙ্ঘ চালক গোলওয়ালকর ১৯৩৮ সালে তাঁর We and our nation defined গ্রন্থে লেখেন- 'হিন্দুস্তানের - হিন্দু মানুষদের দুটোর মধ্যে একটা পথ বেছে নিতে হবে। হয় তাঁরা হিন্দু সংস্কৃতি ও ভাষাকে মেনে নেবেন, হিন্দু ধর্ম শিক্ষা করবেন, হিন্দুকে মর্যাদা দেবেন ও শ্রদ্ধা করবেন, হিন্দু জাতি ও সংস্কৃতির গরবকীর্তন ছাড়া অন্যকোনও ধারণাকে প্রশ্রয় দেবেন না ... এক কথায় তাঁদের বিদেশি হয়ে থাকা বন্ধ করতে হবে। অন্যথায় তাঁরা এদেশে থেকে যেতে পারেন, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে হিন্দুজাতির অধীন হয়ে। কোনও কিছুর ওপর কোনও দাবি থাকবে না তাঁদের, থাকবে না কোনও বিশেষ অধিকার। কোনও বিশেষ সুবিধা পাওয়ারতো প্রশ্নই ওঠে না এমনকী নাগরিক অধিকারও না। এই নীতি কার্যকর করাই এখন এদেরপ্রধান উদ্দেশ্য।

সম্পাদক

শান্তনু দত্ত চৌধুরী

সৌর বসু কর্তৃক সীমান্ত পল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম, পিন ৭৩১২৩৫ থেকে প্রকাশিত।

ই মেইল : nagorik0240@gmail.com ●ফোন : 80178 04019 / 94340 22512 ● ওয়েবসাইট : nagorik.co.in

সরকার নির্বিকার রাহুল প্রিয়াঙ্কার প্রশ্নগুলি বারবার করতে হবে

শুভাশিস মজুমদার

---

২৯ জুলাই, মঙ্গলবারলোকসভায়কেন্দ্রীয় সরকারের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তীব্রআক্রমণ শানিয়েছেন কংগ্রেসের নেতা ও সংসদে বিরোধী দলের নেতারাহুল গান্ধি।

রাহুল গান্ধি অভিযোগ করেন, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অভিযানের সময়মোদী সরকার সেনাবাহিনীর হাতবেঁধে দিয়ে তাঁদেরক্ষমতা খর্ব করেছে। তিনি বলেন, এই অভিযানের প্রকৃত লক্ষ্য ছিল জাতীয় নিরাপত্তা নয়, বরং প্রধানমন্ত্রীকে রক্ষা করা, যাঁর হাতেই তপহেলগামের মানুষেররক্ত লেগে আছেদ।

প্রধানমন্ত্রীকে নিশানা করেরাহুলবলেন, 'দেশআপনার ইমেজ, আপনাররাজনীতি এবং আপনার পিআরের (জনসংযোগ) ঊর্ধ্বে। আমাদের সশস্ত্রবাহিনী আপনার পিআর, আপনার ইমেজ ও রাজনীতির ঊর্ধ্বে। এটুকু বিনম্রতা ও মর্যাদা থাকা উচিত আপনার;আপনার ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থের জন্য সশস্ত্রবাহিনী ও জাতীয় স্বার্থকে বলি দেবেন না।'

রাহুলবলেন, পহেলগামের জঙ্গি হামলা ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের সুপরিকল্পিত চক্রান্ত।

তিনি বলেন, এটা ভারতের পররাষ্ট্রনীতিরব্যর্থতার প্রতিফলন যে ' কোনোদেশ সরাসরি পাকিস্তানকে দোষারোপ করেনি। বরং দেখা গেছে, 'হামলার প্রধান রচয়িতা পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনির হোয়াইট হাউসে গিয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজে অংশ নিয়েছেন।'

রাহুলবলেছেন, 'আমাদের প্রধানমন্ত্রী সেখানে যেতেপারেন না। প্রধানমন্ত্রী কিছুবলেন না। যিনি পুরোঅপারেশনের মাস্টারমাইন্ড, তিনি প্রেসিডেন্টট্রাম্পের সঙ্গেলাঞ্চ করছেন। প্রেসিডেন্টবলছেন, তিনি তাঁকে (মুনিরকে) ধন্যবাদ জানাতে চেয়েছেন যুদ্ধ না করার ও তা বন্ধ করার জন্য।'

প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহের ২৮ জুলাই, সোমবারের লোকসভা বক্তৃতার প্রসঙ্গ টেনে রাহুল দাবি করেন, সশস্ত্রবাহিনী স্বাধীনভাবে অভিযান চালাতে পারেনি;কারণ (সরকারের) রাজনৈতিক নেতৃত্ব তাদেরওপর সীমাবদ্ধতা চাপিয়ে দিয়েছে।

রাহুল বলেন,'প্রতিরক্ষামন্ত্রী সংসদে বললেন, অপারেশন সিঁদুর শুরু হয়রাত ১টা ৫ মিনিটে এবং চলে ২২ মিনিট। এরপর তিনি সবচেয়ে চমকপ্রদ কথা বলেন। তিনি বলেন, ১টা ৩৫ মিনিটে আমরা পাকিস্তানকে জানিয়েছি যে আমরা সামরিক নয়, অসামরিক লক্ষ্য বস্তুতে আঘাত করেছি এবং আমরাআর সংঘর্ষ চাই না। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে ডিজিএমও পাকিস্তানকে যুদ্ধবিরতির অনুরোধ করেন মাত্র ৩০ মিনিটের মধ্যে।'

'মানে, ভারত সরকারপাকিস্তানকে জানিয়ে দিল যে আমাদেব . রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তি নেই, আমরাযুদ্ধ করতে চাই না, শুধু একটা প্রতীকী অভিযান চালিয়েছি। সঙ্গে সঙ্গেই আত্মসমর্পণ। আমাদের পাইলটদের বলা হয়েছিল পাকিস্তানের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমে আঘাত না করতে। মানে আমাদেরপাইলটদেরবলা হয়েছিল; আপনারা যান, পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মুখোমুখি হোন। (কিন্তু) তাঁদের হাত পিছনে বাঁধা আছে,' রাহুলবলেন।

একাত্তরের যুদ্ধে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি আমেরিকান প্রেসিডেন্টের পাঠানো সেভেন্থ ফ্লিটের পরোয়া না করে এবং ভারতের সেনাপ্রধানকে যুদ্ধেরব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে পাকিস্তান ভেঙে দুটুকরো করেন ও প্রায় এক লাখ পাকিস্তানের সেনা বন্দি হয়।

তিনি আরো বলেন, ইন্দোনেশিয়ায় নিযুক্ত ভারতের ডিফেন্স অ্যাটাশে ক্যাপ্টেন শিবকুমারবলেছেন, (অপারেশন সিঁদুরে) ভারত কিছুযুদ্ধবিমান খুইয়েছে। কারণ রাজনৈতিক নেতৃত্ব ভারতের সেনা বাহিনীর কার্যকলাপের(আক্রমণের)উপর সীমারেখা টেনে দিয়েছিল, অর্থাৎ নিষেধাজ্ঞাআরোপিত ছিল। বলেদেওয়া হয়েছিল, পাকিস্তানের সামরিক পরিকাঠামো, তাদেরআকাশ সুরক্ষ াব্যবস্থাবা এয়ার ডিফেন্সকে নিশানা করা চলবে না। সেনাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা না দিয়েপাকিস্তানের এয়ার ডিফেন্সের মুখোমুখি হতেবলা হয় যার পরিণামে ভারত যুদ্ধবিমান খুইয়েছে বলে ইঙ্গিত করা হয়।

রাহুল এদিন চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ (সিডিএস) জেনারেল অনিল চৌহানকে উদ্ধৃত করেবলেন, 'সিডিএস নিজেই প্রশ্ন তুলেছেন, কেন যুদ্ধবিমান ভেঙে পড়ল ? কারণ, প্রথমে ভুল হয়েছিল।পরে তা শুধরে নিয়ে ভারতের যুদ্ধবিমান আকাশে ওড়ে।

রাহুল বলেন, এই ভুল সিডিএস করেননি, এয়ারফোর্স করেনি, করেছে রাজনৈতিক নেতৃত্ব(সরকার)। কারণ এই অপারেশনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করে প্রধানমন্ত্রীর ভাবমূর্তিরক্ষা করা। কারণ, প্রধানমন্ত্রীর হাতে পহেলগামের মানুষেররক্ত লেগে আছে।'

রাহুলের মন্তব্য, 'ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রায় ২৯ বার দাবি করেছেন, তিনিই ভারত পাকিস্তানের যুদ্ধ বিরাম ঘটিয়েছেন এবং ভারত পাঁচটি যুদ্ধবিমান খুইয়েছে। তিনি বলেন, যদি তিনি (ট্রাম্প) মিথ্যাবলেন, তাহলে (প্রধানমন্ত্রী) তাঁর ভাষণে সেটাবলুন। যদি তাঁর সাহস থাকে, তাহলেবলুন ট্রাম্প মিথ্যাবলছেন। যদি ইন্দিরা গান্ধির ৫০ শতাংশ সাহসও তাঁর থাকে, তাহলে বলুন ডোনাল্ড ট্রাম্প একজন মিথ্যাবাদী।'

রাহুল বলেন, বড় বিপদ হলো পাকিস্তান ও চীনের সামরিক বাহিনীর 'মিলিত প্রতিচ্ছবিদ যা মে মাসে অপারেশন সিঁদুরের সময় দেখা গেছে।'

তিনি বলেন, 'ভারতের পররাষ্ট্রনীতির সবচেয়েবড় চ্যালেঞ্জ ছিল পাকিস্তান ও চীনকে আলাদা রাখা। কিন্তু সরকার সেই মূল লক্ষ্যটাই ধ্বংস করেছে। আসল ঘটনা হলো, ভারত সরকারভেবেছিল তারা

শুধু পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়ছে। কিন্তু অপারেশনের সময়েদেখে তারা চীন ও পাকিস্তান উভয়ের বিরুদ্ধেযুদ্ধ করছে।পাকিস্তান বিমানবাহিনীর কৌশল বদলে গেছে, আর চীন পাকিস্তানকে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রের তথ্য সরবরাহ করছিল।'

প্রায় ৩০ মিনিটের বক্তৃতায় রাহুল গান্ধি বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্করকেও কটাক্ষ করেন। তিনি বলেন, জয়শঙ্কর আধুনিক যুদ্ধকৌশল সম্পর্কেঅজ্ঞ। একইসাথে তিনি প্রশ্ন তোলেন;সরকার যেভাবে বলেছে যে অপারেশন সিঁদুরের মাধ্যমে ত্প্রতিরোধ তৈরি' হয়েছে, সেটা আদৌ কতটা যুক্তিযুক্ত।

সংসদে প্রিয়াঙ্কা গান্ধি তাঁর ভাষণে প্রশ্ন তোলেন, কিভাবে পহেলগামে জঙ্গিরা বাধাহীন ভাবে চলে এসে ২৬ জন নিরীহকে হত্যা করলো। কেন সেখানে কোনো নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল না? এক ঘন্টাতেও কোনো নিরাপত্তা দল পৌঁছতে পারেনি। কাশ্মীরে শান্তি ফিরে এসেছে, কাশ্মীরে বেড়াতে যান, জমি কিনুন বলে প্রধানমন্ত্রীর তরফে প্রচার চালানো হয়েছে। এই ব্যর্থতার দায়িত্ব নিয়ে না আই বি চিফ, না স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কেউ পদত্যাগ করেননি। মণিপুর দাঙ্গা, দিল্লির দাঙ্গা, এমনকি পহেলগামের নারকীয় হত্যার ঘটনার পরেওকেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পদত্যাগ করছেন না ?

তিনি আরোবলেন, ২০০৮ এব বম্বেতে পাকিস্তানি জঙ্গি হামলার পরে ঘটনাস্থলেই সব জঙ্গিকে হত্যা করা হয়। একজন জঙ্গি ধরা পড়ে, যার পবে ফাঁসি হয়। ব্যর্থতার দায়স্বীকার করে মহারাষ্ট্রের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ও দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পদত্যাগ করেন। আর এখন কেউ দায়ভার গ্রহণ করে না, কোনো জবাবদিহি নেই। প্রধানমন্ত্রী ট্রাম্পের বক্তব্যেব. কেন বিরোধিতা করছেন না ? কেন বলছেন না, ট্রাম্প যুদ্ধবিরাম মধ্যস্থতা করেন নি, বা ভারতেরযুদ্ধবিমান ভেঙে পড়েনি যেমন ট্রাম্প বলেছেন ?

প্রিয়াঙ্কা পহেলগামে নিহত ২৬ জন ভারতীয়ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে সংসদে শ্রদ্ধা জানান। রাহুলও তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী মোদী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিতশাহ তাঁদের বক্তৃতায় ওই নিহতদের প্রতি কোনও শ্রদ্ধা জানাননি জ্জ কোনও সমবেদনাও জানাননি তাঁদের পরিবারগুলির প্রতি। এতে নিহত শুভম দ্বিবেদীরস্ত্রী ঐশন্যা গভীরআক্ষেপ প্রকাশ করেন। তিনি রাহুল ও প্রিয়াঙ্কা কে ধন্যবাদ জানান। এখন সকলেআশঙ্কা প্রকাশ করছেন এবার সঙ্ঘ পরিবার হিমাঙশী নারওয়ালের মতন ঐশন্যাকেও আক্রমণ শুরু করবে।

রাহুল গান্ধি মানবতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থাপন করেছেন পাকিস্তানেরগোলাবর্ষণ নিহত ২২ জন অভিভাবকেরঅনাথ শিশুদেরলেখা পড়ার দায়িত্ব গ্রহণ করে।

প্রিয়াঙ্কা বলেন পহেলগামে হত্যাকাণ্ডের দায়নেওয়া জঙ্গি সংগঠন টি.আর.এফ. গঠিত হয় ২০১৯ সালে। এরা ২০২০ সাল থেকেই সন্ত্রাসবাদী হামলাশুরু করে।কিন্ত তিন বছরপর ২০২৩ সালেকেন্দ্র তাদের সন্ত্রাসবাদী সংগঠন বলেঘোষণা করে। ২০২৫ এর এপ্রিলের মধ্যেই টি.আর.এফ. কাশ্মীরে ২৫ টি সন্ত্রাসবাদী হামলা চালিয়েছে। এতে ৪১ জন সেনা ও নিরাপত্তা জওয়ান এবং ২৭ জন নাগরিক নিহত হয়েছেন। কেন্দ্র সব জানতো। কিন্তু তারা পহেলগামের হত্যাকাণ্ড আটকাতে পারেনি। কেউ দায়িত্বস্বীকার করেনি জ্জ রাহুল, প্রিয়াঙ্কা তথা বিরোধী নেতৃত্বেরতোলা সমস্ত প্রশ্ন বারবার করেযেতে হবে। বিজেপি নেতৃত্বেরকৌশল, গদি মিডিয়া ও বিজেপির আই টি সেল যতই বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করুক দেশবাসীকে।

বিজেপি শাসিত রাজ্যে ভাষা সন্ত্রাস ও ভুক্তভোগী বাঙালি শ্রমজীবী মানুষ

অমিতাভ সিংহ

সারা দেশে বিজেপির বাংলা ভাষা তথা বাঙালী বিদ্বেষী মনোভাবের বিরুদ্ধে এরাজ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংস্থা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। বিজেপি শাসিত অসম,ওড়িশা, রাজস্থান, দিল্লী, হরিয়ানা, গুজরাত, উত্তরপ্রদেশ , মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যগুলির বাঙালী পরিযায়ী শ্রমিকসহ অন্যান্য পেশার মূলত দরিদ্র সংখ্যালঘু , দলিত তপশীলি জাতি ও উপজাতির মানুষজন নিগৃহীত ও লাঞ্ছনার শিকার। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্বশর্মা বলেছেন 'জনগণনার নথিতে মাতৃভাষা বাংলা উল্লেখ করলেই অসমে বিদেশীর সংখ্যা বোঝা যাবে'। তিনি একই সঙ্গে মুসলিমদের আলাদা করে চিহ্নিত করেন। তারপর দেখা গেল বিজেপি মুখ্যমন্ত্রীদের মধ্যে বাঙালীদের নিপীড়নের প্রতিযোগিতা। এরাজ্যের বিধানসভার বিরোধী নেতা তো কাশ্মীরে তথা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে হিন্দুদের বেড়াতে না যাওয়ার নিদান দিয়ে দিলেন। বোঝা গেল বিজেপির রাজনীতির নির্যাস 'কাশ্মীরের দখল চাই কিন্তু সেখানকার জনগণকে চাই না'। এইভাবেই গত কয়েক বছর রাজ্যে রাজ্যে বিজেপি বিভাজনের রাজনীতির চাষ করে চলেছে।

অসমে বহু বাঙালীকে আটক করে রাখা হয়েছে দিনের পর দিন। বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর ঘটনাও ঘটেছে। ধুবরিতে তিন হাজার মানুষের বাড়ি বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। ২০,০০০ মানুষকে উৎখাত করা হয়। কারণ জমিটি আদানিদের পছন্দের। গোয়ালপাড়ায় ১০৭৮ জন বাসিন্দাদের বাড়ী ভেঙে দেওয়ার নোটিশ দিয়েছে সেখানকার সরকার। কিছুদিন আগে ধরে ধরে মুসলিমদের বাড়ী ভাঙা হয়েছিল। কয়েকজন হাইকোর্টে গিয়েছিল। রায় হয় পাঁচটি পরিবারকে ৩০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার। এই রাজ্যে সাড়ে তিন কোটি বাসিন্দাদের মধ্যে এক কোটি বাঙালি।১৮২৪ সালে অসম রাজাদের হাত থেকে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আসাম অধিকার করে। বাঙালিদের নিয়ে আসা হয়েছিলো এই রাজ্যে সরকারী দপ্তরে কাজকর্ম চালাবার জন্য। পরে শিক্ষকতার পেশায় বাঙালিদের

নিয়োগ করা হয়। ১৮৬০ সাল থেকে আদিবাসীদের এখানে আনা হয়েছিল চা বাগানের শ্রমিক করে। চাষের কাজের জন্য পূর্ব বাংলার দক্ষ আইনি অনুপ্রবেশকারী ওড়িশায় বাংলাদেশী ও রোহিঙ্গা বলে চিহ্নিত তালিকায় বাঙালী হিন্দুদের নাম ভুরি ভুরি। কালিদাসী বিশ্বাস,অশোক রায়,মায়ারানী দাস,সুরা বালা এরা রোহিঙ্গা? রায়গড় থানার রিপোর্টে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের নামের ছড়াছড়ি।

হরিয়ানায় আসন্নপ্রসবা স্ত্রীকে হাসপাতালে ভর্তি করার বদলে তার পুরো পরিবারকে আটকে রাখা হয়েছে। বলা হয়েছে যেভাবেই হোক সমস্ত নথি দেখাতে হবে। বাবা মায়েরা যাতে নিজেদের বাংলাদেশি বলে স্বীকারোক্তি দেয় তার জন্য বেধড়ক মার দেওয়া হয়েছে বৃদ্ধ মানুষদের। নেহেরু কলোনীতে ৫০ বছরেরও বেশী সময় ধরে বসবাসকারী, কর দিচ্ছে, তাও তাদের বাড়ীর ডেমলিশন অর্ডার হয়ে গেছে।

গুরুগ্রামে বাংলায় কথা বলার অপরাধে আটকে রাখা হয়েছে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের। এই বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে কংগ্রেস সংসদীয় দলের বৈঠকে আলোচনার জন্য। এরাজ্যে মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষজন ও রাজবংশী কথ্য ভাষায় কথা বললেও আটক করা হচ্ছে। এখানে বস্তির সামনে সকাল সন্ধায় একটি গাড়ী দাঁড়িয়ে থাকে। ভেতরে অপেক্ষা করা লোকজনেরা উদাসীন ভঙ্গিতে ইতস্তত ঘোরাঘুরি করে। কাজে যাওয়া ও কাজ থেকে ফেরা বাঙালী পরিযায়ী শ্রমিকদের সঙ্গে খোসগল্প করতে করতে তুলে নিয়ে যায় এক অজ্ঞাতবাসের উদ্দেশ্যে। বাংলাদেশি বলে গালাগাল, মারধোর। জোর করে বাংলাদেশী বলে স্বীকার করাবার চেষ্টা। না পারলে আধমরা করে যেখানে সেখানে ছেড়ে দেওয়া। বেচারিরা কোনমতে হাতড়ে হাতড়ে নিজ বস্তিতে ফেরে। বেঙ্গলি মার্কেটের বস্তির ৭০০/৮০০ ঘরের বাঙালীরা পালিয়ে বেঁচেছে।

ছত্রিশগড়ে ৬০ টি মুসলিম পরিবারের বাড়ী ভাঙা হয়েছে। এরাজ্যের জঙ্গল সাফ হয়ে গেছে আদানিদের জমি দিতে গিয়ে। মহারাষ্ট্রের থানেতে বেছে বেছে দলিত ও মুসলমদের বাড়ী ভাঙা হয়েছে।

মহারাষ্ট্রে টুকরো টুকরো করে খুন করা হয়েছে উত্তর ২৪ পরগনার বাদুরিয়ার বাঙালী পরিযায়ী শ্রমিককে।

দিল্লীর বসন্তকুঞ্জের জয়হিন্দ কলোনী কয়েকদিন আগে খবরে এসেছিল। আইনসিদ্ধ নথি ও পরিচয়পত্র থাকা সত্ত্বেও বাংলায় কথা বলা বাসিন্দাদের হেনস্থা করে অনুপ্রবেশকারী বলে দাগিয়ে দেওয়া হল। জলের জোগান বন্ধ। বিদ্যুৎ এর লাইন কেটে দিয়ে এই গরমে তাদের রাস্তায় এনে দেওয়া হল। শিশুরা তারস্বরে চিৎকার করছে রাস্তায় বসে এই দৃশ্য দেখা কতটা যন্ত্রনাকর তা যারা দেখেছেন তারা জীবনেও ভুলতে পারবেন না। বারবার থানায় ডেকে ভয় দেখানো হচ্ছে, বাবা ঠাকুরদার পরিচয়পত্র দেখতে চাওয়া হচ্ছে। দেখাতে না পারলে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার ভীতিপ্রদর্শন তো আছেই। শোনা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে এই এলাকায় অবৈধ বসতি চিহ্নিত করে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। পাতিয়ালা হাউস কোর্ট রায় দিয়েছে ওই এলাকায় কোন উচ্ছেদ অভিযান চালানো যাবে না।

চাণক্যপুরীর বিবেকানন্দ ক্যাম্পের বাঙালীদের পরিচয়পত্র কেড়ে নিচ্ছে দিল্লী পুলিশ। বিজেপির মদতে দেশটা কি পুলিশ শাসিত হয়ে যাচ্ছে দিন দিন?

নিউ ইয়র্কের হিউম্যান রাইটস রিপোর্টে প্রকাশিত নিবন্ধে বলা হয়েছে ক্ষুন্নযথেচ্ছভাবে ভারতে বাঙালী নাগরিকদের দেশ থেকে তাড়ানো হচ্ছে। যে বেআইনী অনুপ্রবেশের কথা বলা হচ্ছে তা গ্রহনযোগ্য নয়। অসম,গুজরাত, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, ওড়িশার মতো বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে এসব চলছে'। কলকাতা হাইকোর্ট কেন্দ্রের কাছে জানতে চেয়েছে দেশে আচমকা জুন মাসে কেন বাংলাদেশি চিহ্নিতকরণ শুরু হল। প্রায়শই শুনি দেশে নাকি রোহিঙ্গা মুসলিমে ভরে গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী নেতা আবার এক কাঠি ওপরে। তার দাবী নিউটাউন, রাজারহাটে নাকি বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীতে ভরে গিয়েছে। বর্ডারে কেন্দ্রীয় বাহিনী বা বিএসএফ কি করছিল? তাদের নিয়ন্ত্রন কে করে? বিজেপি নেতারা বলছে বাংলায় নাকি ১ কোটি ২৫ লক্ষ রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ ঘটেছে, যেখানে রাষ্ট্রপুঞ্জের তথ্যে রোহিঙ্গার সংখ্যা ১৪ লক্ষ। খুব বেশী হলে পাঁচ সাতশো রোহিঙ্গা এরাজ্যে ঢুকেছে। যে কজনই ঢুকুক কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দপ্তর কি নাকে তেল দিয়ে তখন ঘুমাচ্ছিল?

নয়ডায় কর্মরত এক বাঙালি সাংবাদিক যিনি অসম,মহারাষ্ট্র ও ওড়িশার দায়িত্বপ্রাপ্ত তিনি নাকি বাঙালীদের ওপর কোন সন্ত্রাস দেখতে পান নি। সব জায়গায় নাকি বাঙালীরা রসেবসে আছেন। তিনি এই সব অভিযোগ শুনে নাকি হো হো করে হাসছেন। তার মতে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকের অস্তিত্বের সংকট।তারা নাকি তার কাছে বলেছে যে তাদের কাজ অনুপ্রবেশকারীরা দখল করে নিচ্ছে। তাহলে সাংবাদিকটিকে বলতে হয় এদের সাহায্য নিয়ে অনুপ্রবেশকারীদের ধরিয়ে দিন না।তাহলে দেশে কয়েক লক্ষ বাঙালী পরিযায়ী শ্রমিকেরা বিজপির এই প্রবল বাঙালী বিদ্বেষ থেকে রক্ষা পেতে পারেন। কিন্তু তা হওয়ার নয়। বিজেপির ডিএনএ তে মুসলীম ও বাঙালী বিদ্বেষ। আজ গোদী মিডিয়ার ও তাদের উচ্ছিষ্টপুষ্ট লোকেরা বুঝতে পারছেন না একদিন তাদের ওপরও খাঁড়ার ঘা নেমে আসবে। হিটলারের সময় তার একসময়ের সমর্থক ও পরবর্তীকালে বিরোধী যাজক মার্টিন নিমোলারের একটি বিখ্যাত উক্তি উল্লেখ করি। 'একরাত্রে যখন তারা ইহুদীদের খুঁজছিল তখন আমি প্রতিবাদ করি নি,কারণ আমি তো ইহুদী নই। তারা এরপর এলো কম্যুনিস্টদের খুঁজতে এলো, আমি এবারও কোনও protibad করিনি, কারণ আমি কম্যুনিস্ট নই । তারা আবার ক্যাথলিক খুঁজতে এল। আমি তো ক্যথলিক নই,তাই আমি প্রতিবাদ করি নি। বেশ কিছুদিন পর তারা আবার এল প্রটেস্ট্যান্ট দের খুঁজতে, আমি সেদিনও এর প্রতিবাদ করি নি, কারণ আমি তো প্রটেস্ট্যান্ট নই। এরপর একদিন রাত্রে তারা আমায় ধরে নিয়ে যেতে এল, কেউই এর প্রতিবাদ করতে এগিয়ে এল না,কারণ তখন তো কেউই অবশিষ্ট ছিল না'।

পরিশেষে বলি বাঙালীদের ওপর এই আক্রমণ শুধু দুর্ভাগ্যজনক নয় এক বিপজ্জনক প্রবনতাও বটে। উচ্চবিত্ত বাঙালীদের এতে কিছু যায় আসে না কারণ এখনও তাদের ওপর এই আক্রমণ শুরু হয় নি। মূলত বাঙালী শ্রমিক, ধর্মপরিচয়ে বেশীরভাগই সংখ্যালঘু তাদেরই বাংলাদেশী বলে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ স্বাধীনতার পর থেকেই অন্য রাজ্যে বিভিন্ন কাজে যাওয়া আশা করেন।মটর মেকানিক, কাঠের কাজ, জরির কাজ, হীরে কাটিং, অলংকার নির্মাণ, নির্মাণ শিল্পে রাজমিস্ত্রি ও জোগাড়ের কাজে এরা বিশেষভাবে দক্ষ। এতকাল তাদের ওপর এরকম আক্রমণ হয় নি। গত কয়েকমাস ধরে মূলত বিজেপির প্ররোচনায়, বিশেষ করে বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর সেদেশের নতুন সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি পর থেকেই এই নক্কারজনক কুকর্মটি সংগঠিত হচ্ছে। বাংলাভাষী মুসলমান মানেই বাংলাদেশী- তার অর্থ তারাও ভারতের শত্রু এই ভুল ন্যারেটিভ সমাজে বিষক্রিয়া ছড়িয়ে দিয়েছে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির কারবারিরা।এই বিষ ছড়িয়ে পড়লে তা থেকে তারাও যে বাঁচতে পারবেন না তা তারা উপলব্ধি করতে পারছেন না।

এবিষয়ে সামাজিক সচেতনতা জরুরি। রাজনৈতিক বিচার কোন পথ হতে পারে না। ভাষা সংস্কৃতির বা আঞ্চলিক পরিচয়ের ভিত্তিতে বাঙালী শ্রমিকদের ধারাবাহিক হেনস্থা করা সংবিধানের স্বীকৃত মূল্যবোধের ও বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের যে ধরণাটি আমরা আজন্ম লালনপালন করে এসেছি তার বিরোধী। সংবিধানের স্বীকৃত অধিকার লঙ্ঘিত হলে তা ভারতের সার্বভৌমত্বের ওপর আঘাত বললে অতুক্তি হবে না।

বাঙালি হলেই সন্দেহজনক, আর বাঙালি মুসলমান হলে তো কথাই নেই

সুজন ভট্টাচার্য

শুরু হয়েছিল ব্যাঙ্ক ও বিভিন্ন কেন্দ্রিয় সরকারি অফিসে অবাঙালী কর্মীদের ঢালাও হারে বদলি করে আনানোর মাধ্যমে। তারা বাংলা বোঝেন না, এই অজুহাতে চালু হল বাঙালী গ্রাহকদের হিন্দি বলতে বাধ্য করা।

দ্বিতীয় পর্যায়ে শুরু হল রাস্তাঘাটেও হিন্দি বলানোর চক্কর। আর সরল যুক্তি, 'বাংলা বোলনা হ্যাঁয় তো বাংলাদেশ চলা যাও'। আর সেই সঙ্গে আছে সল্টলেকের সেই অবাঙালী মহিলার প্রবাদপ্রতিম উক্তি, 'আজকাল সল্ট লেক মে ভি বঙ্গালী বহত জাদা হো গিয়া'।

তৃতীয় পর্যায়। বাংলাদেশে ক্ষমতার পালাবদল ও অপারেশন সিঁদুরের হাত ধরে পুশ ব্যাক। প্রথমে মিডিয়া আর মিডিয়া-ভোক্তা প্রায় সবাই বহুত খুশ। এই তো চাই। অনুপ্রবেশকারীদের ঘাড় ধাক্কা দিয়ে এভাবেই বের করে দিতে হবে। তারপরই একদিন অকস্মাৎ ধরা পড়ল দুজন এমন মানুষকে পাচার করা হল যারা জন্মসূত্রেই ভারতীয়। শেষ পর্যন্ত বিজিবি-র মাধ্যমে ফেরত নিতে হল। প্রতিক্রিয়া বড় মজাদার। একটু আধটু ভুল হতেই পারে। আর যাই হোক, মুসলমান তো!

পে লোডারে চাপিয়ে কাঁটাতার পার করিয়ে দেওয়া হল। কাকে? নাগরিকত্ব আইন বাদ দিন, স্বাধীনতারও অন্তত ৬ বছর আগে যার পরিবারের জমি কেনার সরকারি নথি আছে। আহাহা, বাদ দিন। নামটা দেখুন, মুসলমান যে। মানুষ বাসে চাপে, ট্রেনে চাপে, কপাল ভাল হলে মহাকাশযানেও। কিন্তু পে লোডারে কাউকে চাপিয়ে এক্সপোর্ট করার ভাবনার জন্য মগজে প্রচুর গোবর সার চাই।

হ্যাঁ, স্রেফ বাংলাভাষী বলেই আজ উত্তরপ্রদেশ, দিল্লী, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, হিমাচলপ্রদেশ,ওড়িষায় পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর রাষ্ট্রীয় নিপীড়ণ চলছে। আসামের মুখ্যমন্ত্রী আরেক ধাপ এগিয়ে বলেছেন, সেনসাসে মাতৃভাষা বাংলা বললেই অনুপ্রবেশকারী বলে চিনে নিতে সুবিধা হবে। আসাম অবশ্য বরাক মাতৃভাষা দিবসের ধাত্রীভূমি। তাতে কি?

না, এই লাগাতার বদমায়েশির বিরুদ্ধে বাঙালী মাত্রেই এক নন। একটা বড় অংশ যারা নাগপুরি কমলালেবুর ঢেঁকুর তোলেন, তারা সোচ্চারে সমর্থকও বটে। তাই পশ্চিমবঙ্গে জন্ম কিংবা বিবাহসূত্রে ৪০ বছর ধরে স্থায়ী বসবাস, এমন মানুষকেও আসাম থেকে সন্দেহভাজন নাগরিকত্বের নোটিশ পাঠানো হয়। আর গেরুয়া নেতাকর্মীরা তার জাস্টিফিকেশন দেন। তবে এরা কেউই কিন্তু মুসলমান নন, নিখাদ হিন্দু রাজবংশী। এখনো পর্যন্ত একজন রাজবংশী গেরুয়া নেতাকে এই কাজের বিরোধিতা করতে দেখলাম না। তারা শুধু বলছেন, পাশে আছি।

উলটে যুক্তি আসছে, এত সংখ্যক বাঙালিকে স্রেফ দিনমজুরি করার জন্য ভিন রাজ্যে যেতে হচ্ছে কেন! এটা তো রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা। ঠিকই তো। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এমন হিন্দিভাষী দিনমজুরের চেহারাটা কি? সংখ্যাতত্ত্ব বাদ দিন, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বলি। লক ডাউনের সময় টানা রিলিফের কাজ চালিয়েছিলাম আমরা। তখনই দেখলাম আমাদের ছোট্ট এই বারাসাত শহরেই কি পরিমাণে বিহার, ঝাড়খণ্ড, পাঞ্জাব, কিংবা রাজস্থানের দিনমজুর পরিবার থাকেন। আমরা প্রতি সপ্তাহে এমন ১৯৫টি পরিবারকে রেশন দিতাম। তাহলে সেটা কি সেইসব রাজ্যের ব্যার্থতা নয়?

হ্যাঁ, রোজগারের সম্ভাবনা প্রতিদিনই কমছে। কিন্তু মুর্শিদাবাদের মুসলিম রাজমিস্ত্রীদের কদর সারা ভারতেই চিরকাল ছিল এবং আছে। যেমন আছে হাওড়া, হুগলী, বর্ধমানের স্বর্ণশিল্পীদের। এরা তো বাইরে যাবেনই। যেমন এই রাজ্যের ইটভাটায় ঝাড়খণ্ড-বিহারের আদিবাসী শ্রমিকদের ব্যাপক কদর। এরপরেও একটা মানসিক প্রতিবন্ধকতা আছে। বাংলার বাইরে গিয়ে যে কাজ আপনি জীবনধারণের জন্য স্বেচ্ছায় করতে পারবেন, চেনা জায়গায় অনেকক্ষেত্রেই পারবেন না। স্রেফ লোকলজ্জার খাতিরে। এটা একটা বড় সমস্যা।

তাই বলে কি অনুপ্রবেশ নেই? অবশ্যই আছে। যেখানেই সীমান্ত থাকবে, সেখানেই থাকবে অনুপ্রবেশ, অবৈধ পথে। একটা বড় কারণ

অবশ্য জীবিকা। এছাড়াও রাজনৈতিক বা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষও বড় ভূমিকা পালন করে। ধরা যাক শেখ হাসিনা ওয়াজেদ। তিনি যদি ভারতে থাকেন, তাহলে কি তাকে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বলা হবে? উত্তরটা জরুরি।

গেরুয়াজীবীরা বলছেন, হিন্দু হলেই সাতখুন মাপ। কোন কাগজ না দেখিয়েই আপনার নাম ভোটার লিস্টে জ্বলজ্বল করবে। তাই? তাহলে আসামে এন আর সি-তে ১৯ লক্ষ হিন্দুর নাম বাদ গেল কিভাবে? কিংবা পাকিস্থান থেকে আসা হিন্দু পরিবারগুলোকে শেষ পর্যন্ত ফিরে যেতে হল কেন? না, এঁদের কাছে উত্তর পাবেন না। কারণ হিন্দুপ্রেম আসলে একটা মুখোশ। আড়ালে আছে অন্য ধান্দা।

পশ্চিমবঙ্গের অ-গেরুয়া দলগুলোর নেতানেত্রীদের হাজার গালিগালাজ করেন মানুষে। অনেক ক্ষেত্রেই সঙ্গত কারণও অবশ্যই আছে। কিন্তু এর পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের গেরুয়া কোং-এর একটা অনন্য বৈশিষ্ট্য আছে। এরা ছাগলের তৃতীয় সন্তানের মত। হিন্দিভাষীদের সঙ্গে কোলাকুলি করতে গিয়ে এরা বাঙালির জাত মারতে পারলে খুব খুশি হন। বাকিরা খাবলে খান, আর এরা উচ্ছিষ্ট ভিক্ষা পেয়েই খুশি।

মোদ্দা কথা, এই অভিযান নিঃসন্দেহে বাঙালীবিদ্বেষী। কিন্তু আরেকটু তলিয়ে ভাবুন। কারা অপদস্থ হচ্ছেন, কাদের পে লোডারে চাপিয়ে বিশ্বভ্রমণ করানো হচ্ছে? দেখবেন সবাই হলেন হতদরিদ্র, নিরন্ন, শ্রমজীবী মানুষ। বিহারে কত লক্ষ মানুষের ঠিকানায় গিয়ে নাকি তাদের খোঁজ পাওয়া যায়নি বলে অনেকেই উদবাহু হয়ে লাফাচ্ছেন। এরাই নাকি বাংলাদেশি কিংবা রোহিঙ্গা। একটু খোঁজ নিয়ে দেখুন। হয়তো আপনার পাড়ার রাস্তাতেই দেখবেন ঝুড়ি-কোদাল নিয়ে বসে আছেন এঁদের কেউ কেউ।

রাজনীতি করুন, আত্মসমৃদ্ধির রাস্তা খুঁজুন। কামাই না হলে লোকে আজকাল আর রাজনীতি করে না বলেই অনেকেরই ধারণা। কিন্তু আত্মসম্মান বলেও যে একটা বস্তু আছে, সেটাও ভুলে যাবেন? ভুলুন, কিন্তু নিজস্ব পশ্চাতদেশ অন্তত ইনসিয়োর করিয়ে রাখুন।

ভ্রম সংশোধন

নাগরিক - এর ১৭ জুলাই, ২০২৫ সংখ্যায় ঔপন্যাসিক প্রফুল্ল রায় সম্পর্কিত রচনায় , পৃষ্ঠা ১৭ - র তৃতীয় প্যারাগ্রাফে অনবধানতাবশত একটি প্রমাদ ঘটেছে, যার সংশোধন প্রয়োজন। তৃতীয় প্যারার শেষ বাক্যটি হবে -এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাঁর (প্রফুল্ল রায়ের) প্রথম উপন্যাস ' পূর্ব পার্বতী ' দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং দেশভাগের ভিত্তিতে রচিত 'কেয়াপাতার নৌকো' উপন্যাসটি মণীন্দ্র রায় সম্পাদিত ' অমৃত" পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে ১৯৬৮ - ৬৯ সালে প্রকাশিত হয়। এই অনিচ্ছাকৃত প্রমাদের জন্য সবিশেষ দুঃখিত

------সম্পাদক , নাগরিক।

আসাম গোলাঘাটের মুসলিমদের আফগানিস্তানে চলে যেতে বললেন হিমন্ত বিশ্বশর্মা

মনিরুল হক

গোয়ালপাড়া, নওগাঁ, বরপেটা, শোনিতপুর, লখিমপুর, দরং এর পর এবার গোলাঘাটের পালা। এই জেলার অন্তর্গত উরিয়ামঘাটের রেংমা বনাঞ্চল সংলগ্ন গ্রামগুলিতে কয়েক পুরুষ ধরে বাস করা ১৫০০ মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষকে তাঁদের ভিটে-মাটি থেকে উচ্ছেদ করে রাস্তায় এনে দাঁড় করিয়েছেন আসামের বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। এখন এই মানুষগুলি কোথায় যাবেন, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ' There is plenty of land in Bangladesh Sfor themV. But if there is any problem then it can be in Afganisthan'

গত ২৯ জুলাই বিশাল পুলিশ বাহিনী যন্ত্রপাতি ও লোকলস্কর নিয়ে পুলিশকর্তা ও বনকর্তারা হাজির হন গোলাঘাটের আসাম-নাগাল্যান্ড সীমান্ত এলাকার গ্রামগুলিতে। তাঁদের লক্ষ্য ১২ টি গ্রামের ২৬৮৪ টি বাড়ি। এগুলি তাঁরা ভেঙে চলেছেন, সঙ্গে স্কুল মসজিদ ও গীর্জাও আছে। এই লেখা যখন প্রেসে যাবে তখন সম্ভবত গ্রামগুলি পুরোপুরি স্তব্ধ হয়ে যাবে। মুসলিম উচ্ছেদতথা নিধনের এই পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য অজুহাত হিসাবেখাড়া করা হয়েছে বনভূমি রক্ষার পরিকল্পনা। শুধু এই এলাকাতেই নাকি উদ্ধার করা হবে ১১০০০ বিঘা বনভুমি। তবে বনভুমি উদ্ধারের কথা যে সত্যিই কথার কথা তা একই এলাকায় একইসঙ্গে বাস করা অমুসলিম জনগনের প্রতি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই জানা-বোঝা যাচ্ছে। ১৫০০ জন মুসলিম ছাড়াও এই এলাকায় আরও ৫০০ জন মানুষ বাস করেন। তাঁরা বোড়ো, নেপালি ও মণিপুরি। তাঁরা এই উচ্ছেদ নীতি থেকে ছাড় পাবেন কারণ তাঁরা Forest Rights Committee থেকে শংসাপত্র পেয়েছেন। এই ৫০০ জন মানুষের মতো উল্লিখিত ১৫০০ মুসলিম মানুষজনও 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামীণ এর আওয়ায় বাড়ি পেয়েছেন, 'জল জীবন মিশন'-এর আওতায় জল পেয়েছেন, 'সর্ব শিক্ষা অভিযান'- এর আওতায় গড়ে ওঠা স্কুল পেয়েছেন। তাঁরা দোকান করেছেন, ব্যবসা করেছেন, মসজিদ বানিয়েছেন। অর্থাৎ স্বাভাবিক জীবনই যাপন করছিলেন। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে তাঁদের বাড়ি নেই, খাবার নেই, পানীয় জলও নেই। জলজ্যান্ত মানুষগুলি এখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উপহাসের পাত্র! এটা দেখছেন সারা রাজ্য, সারা দেশের সব মানুষ। এমন বৈষম্যের উচ্ছেদই কে কবে দেখেছেন!

একজন ভুক্তভোগী আলি কাজি বলেছেন, তাঁর বাবা নওগাঁ থেকে এসেছিলেন ৪০ বছর আগে, সরকারের ডাকে। তখন ছিল জনতা আমল, মুখ্যমন্ত্রী গোলাপ বরবরা। ১৯৮৫ সালে অ.গ.প আমলেও বাইরে থেকে এখানে লোকজনকে ডেকে আনা হয়েছে। তখন সরকারের উদ্দেশ্য ছিল নাগাল্যান্ডের সঙ্গে সীমানা সুরক্ষিত রাখা।

এদিকে নাগাল্যান্ডের দুটি সংগঠন 'National Social Council of Nagaland এবং Konyak Students' Union আশঙ্কা প্রকাশ করেছে যে আসামের অশান্তির ফলে নতুন করে সীমান্ত সমস্যা জটিল হতে পারে। এমনিতেই আসামের সঙ্গে নাগাল্যান্ডের সীমান্ত জটিলতা অনেক পুরোনো। তা আরও বাড়তে পারে বলে মনে হচ্ছে। আসামের সাথে অরুণাচল, মণিপুর, মেঘালয়, ত্রিপুরা, মিজোরামেরও সীমান্ত সমস্যা বিরাজমান।

অনেকে মনে করছেন আগামী বছরের বিধানসভা নির্বাচনের দিকে খেয়াল রেখেই হিমন্তবাবু এইসব উত্তেজনামূলক সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করছেন এবং তা কার্যকর করছেন। কিন্তু ভুললে চলবে না, মানুষকে বিভ্রান্ত করে রাখা বিজেপির একটি কৌশল। আর সবচেয়ে বড় কথা আর এস এস - এর বিকৃত আদর্শ তো মুসলিমদের হেনস্থা করা, মুসলিমদের নিধন করার পক্ষেই তারা কথা বলে। হিমন্ত বিশ্বশর্মা আর এস এস-এর সেই কর্মসূচী-ই কার্যকর করে চলেছেন।

গাজা সংকটে নির্বিকার মোদী সরকার, প্রধানমন্ত্রীকে ভারতের কণ্ঠস্বর তুলে ধরতেই হবে ; সোনিয়া গান্ধি

[ভারত সবসময় দুই-রাষ্ট্র সমাধান এবং ইজরায়েল ও ফিলিস্তিনের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত শান্তি স্থাপনের পক্ষে ছিল। ১৯৭৪ সালে ইন্দিরা গান্ধির নেতৃত্বে অ-আরব দেশ হিসেবে ভারত প্রথম ফিলিস্তিনি মুক্তি সংগঠন (পিএলও)-কে ফিলিস্তিনি জনগণের একমাত্র এবং বৈধ প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ১৯৮৮ সালে ভারত ছিল সেই প্রথম দেশগুলির মধ্যে অন্যতম যারা ফিলিস্তিন সরকারকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয় ।দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা ইজরায়েলি আক্রমণে গাজা ভূখণ্ডের প্রায় ৬০ হাজার নিরীহ মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে। গাজার অধিকাংশ স্থান ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে সব থেকে বড় সংকট খাদ্যের ও চিকিৎসার। অপুষ্টির শিকার কয়েক হাজার সাধারণ মানুষ যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিশু। প্রতিদিন কয়েক শত শিশুকে অপুষ্টি জনিত কারণে জীবন বাঁচাতে হাসপাতালে ভর্তি করানো হচ্ছে। কিন্তু বিধ্বস্ত হাসপাতালগুলি কি চিকিৎসা করবে ?খবরে প্রকাশ, গাজার ত্রাণ শিবিরগুলিতে ত্রাণ নিতে আসা আর্ত মানুষের উপর ইজরায়েলি মদতপুষ্ট বন্দুকধারীরা গুলি চালাচ্ছে।

এমতাবস্থায় মোদী সরকার নির্বিকার থাকায়, কলম ধরলেন কংগ্রেস সংসদীয় দলের সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধি। বহুল প্রচারিত হিন্দি দৈনিক জাগরণ সংবাদপত্রে ২৮ জুলাই তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে। এর ভাবানুবাদ, মূল লেখা থেকে যথা সম্ভব পরিবতর্ন না ঘটিয়ে, নিচে দেওয়া হল।]

সোনিয়া গান্ধি বলেন ৭ অক্টোবর, ২০২৩-এ ইজরায়েলে নিরীহ পুরুষ, নারী ও শিশুদের উপর হামাসের নির্মম হামলা কিংবা তার পর ইজরায়েলি জনগণকে বন্ধক করে রাখার কোনও ন্যায্যতা নেই। এই ঘটনার বারবার এবং নিঃশর্ত নিন্দা করা উচিত। তবে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের একজন সদস্য (দেশ) এবং সর্বোপরি মানুষ হিসেবে আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, গাজার জনগণের উপর ইজরায়েল সরকারের প্রতিক্রিয়া শুধু মাত্র উগ্র নয়, বরং সম্পূর্ণ অপরাধমূলক।

গত প্রায় দুই বছরে ৫৫,০০০-রও বেশি ফিলিস্তিনি নাগরিক নিহত হয়েছেন, যাঁদের মধ্যে ১৭,০০০ শিশু। গাজার বেশিরভাগ আবাসিক ভবনকে ইচ্ছাকৃতভাবে বিমান হামলার মাধ্যমে ধ্বংস করা হয়েছে। এর মধ্যে হাসপাতালও রয়েছে। গাজার সামাজিক পরিকাঠামো সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়েছে। অক্টোবর ২০২৩ থেকে শুরু হওয়া ঘটনাগুলি অত্যন্ত দুশ্চিন্তাজনক। সাম্প্রতিক মাসগুলিতে পরিস্থিতি আরও মর্মান্তিক হয়ে উঠেছে। আমরা দেখেছি, কীভাবে মানবিক সহায়তাকেও নিষ্ঠুর কৌশলের অংশে পরিণত করা হয়েছে।

ইজরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী গাজার উপর সামরিক অবরোধ করে ওষুধ, খাদ্য ও জ্বালানির সরবরাহ ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যাহত করেছে। অত্যাবশ্যক মৌলিক পরিকাঠামো ধ্বংস ও সাধারণ নাগরিকদের নির্বিচারে হত্যা একটি মানবসৃষ্ট বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। এই অবরোধ পরিস্থিতিকে আরও ভয়াবহ করে তুলেছে। অনাহারে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়ার কৌশল নিঃসন্দেহে মানবতাবিরোধী অপরাধ।

এই ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যেও ইজরায়েল জাতিসংঘ ও অন্যান্য বৈশ্বিক সংস্থাগুলি থেকে (গাজা ভূখণ্ডের জন্য) আসা মানবিক সহায়তা প্রত্যাখ্যান করেছে বা তা আটকে রেখেছে। মানবতার সকল ধারণাকে বিকৃত করে, ইজরায়েলি সেনারা এমন সব মানুষদের উপর গুলি চালিয়েছে যাঁরা নিজেদের পরিবারের জন্য খাদ্য জোগাড় করার চেষ্টা করছিল। জাতিসংঘ নিজেই এ নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। এমনকি ইজরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীকেও এই নির্মম বাস্তবতা স্বীকার করতে হয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে গাজায় ইজরায়েলি সামরিক অভিযানের প্রভাব গণহত্যার সমান এবং এর লক্ষ্য হলো গাজা উপত্যকা থেকে ফিলিস্তিনি জনগণকে জাতিগতভাবে নিশ্চিহ্ন করা। এই নির্মমতা ১৯৪৮ সালের 'নাকবা' বিপর্যয়ের স্মৃতি উস্কে দেয়, যেখানে ফিলিস্তিনিদের তাদের ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল। এই নৃশংসতা কিছু অতি ঘৃণ্য উদ্দেশ্যের অংশ; যার মধ্যে রয়েছে ঔপনিবেশিক মানসিকতা ও কিছু লোভী রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ীদের স্বার্থ।

দুর্ভাগ্যবশত, গাজা সংকট আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার গভীর দুর্বলতাকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। গাজায় অবিলম্বে, শর্তহীন ও স্থায়ী যুদ্ধবিরতির দাবি জানিয়ে, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের প্রস্তাবগুলি উপেক্ষিত হয়েছে। নিরাপত্তা পরিষদ (গাজায়) সাধারণ নাগরিকদের উপর হামলা এবং পরিকাঠামো ধ্বংসের দায়ে ইজরায়েলি সরকারের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে ব্যর্থ হয়েছে। ২৬ জানুয়ারি, ২০২৪-এ

আন্তর্জাতিক ন্যায় আদালত ইজরায়েলকে গণহত্যামূলক কার্যকলাপ বন্ধ করতে এবং নাগরিকদের প্রয়োজনীয় পরিষেবা ও মানবিক সহায়তা পৌঁছে দিতে নির্দেশ দেয়।

এই নির্দেশও উপেক্ষা করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থন ইজরায়েলকে এই কাজগুলো করার উৎসাহ ও সাহস যুগিয়েছে। যখন আন্তর্জাতিক আইন ও প্রতিষ্ঠান কার্যত অচল হয়ে পড়েছে, তখন গাজার মানুষের অধিকার রক্ষার লড়াই অন্য দেশগুলোর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকা সাহসিকতার সঙ্গে ইজরায়েলকে আন্তর্জাতিক আদালতে নিয়ে গিয়েছে এবং এখন ব্রাজিলও সেই পথে হাঁটছে।

ফ্রান্স ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আর ব্রিটেন ও কানাডার মতো দেশগুলি গাজায় আগ্রাসন চালানো ইজরায়েলি নেতাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। এমনকি ইজরায়েলের মধ্যেও প্রতিবাদ জোরালো হচ্ছে। তাদের এক প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী গাজায় যুদ্ধাপরাধের বাস্তবতা স্বীকার করেছেন। এই মানবিক সংকট নিয়ে সারা বিশ্বে যে সচেতনতা জেগে উঠছে, তার পটভূমিতে এটা জাতীয় লজ্জার বিষয় যে ভারত এ নিয়ে নির্বিকার।

ভারত দীর্ঘদিন ধরে বৈশ্বিক ন্যায়বিচারের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে। ভারত ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে বৈশ্বিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে, (অতীতে) স্নায়ুযুদ্ধের সময় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী অবস্থান নিয়েছে এবং বর্ণবৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। অথচ আজ যখন নিরপরাধ মানুষদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হচ্ছে, তখন ভারতের নীরবতা আমাদের জাতীয় বিবেকের অবমাননা, আমাদের ঐতিহাসিক দায়িত্বের প্রতি অবহেলা এবং আমাদের সাংবিধানিক মূল্যবোধের প্রতি কাপুরুষতাপূর্ণ বিশ্বাসঘাতকতার নামান্তর।

রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিগত নির্দেশিকায় সরকারকে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য, ন্যায্য আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রক্ষার জন্য এবং আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করার আশা ব্যক্ত করা হয়। কিন্তু আজ ইজরায়েল যখন আন্তর্জাতিক আইন, মানবাধিকার এবং ন্যায়বিচারের মৌলিক ধারণাকে পদদলিত করছে, তখন ভারতের বর্তমান সরকারের নৈতিক কৌশলহীনতা আমাদের সাংবিধানিক দায়িত্বকে উপেক্ষা করার সমান।

ভারত সবসময় দুই-রাষ্ট্র সমাধান নীতির, এবং ইজরায়েল-ফিলিস্তিনের মধ্যে ন্যায্য শান্তি স্থাপনের পক্ষে। ১৯৭৪ সালে ইন্দিরা গান্ধির নেতৃত্বে ভারত প্রথম অ-আরব দেশ হিসেবে পিএলও-কে স্বীকৃতি দেয় এবং ১৯৮৮ সালে ভারত প্রথম সারির দেশগুলির মধ্যে (অন্যতম) ছিল যারা ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

ইজরায়েলের গাজা-জুড়ে নিরবচ্ছিন্ন নিপীড়নের মধ্যেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর লজ্জাজনক নীরবতা অত্যন্ত হতাশাজনক। এটি এক প্রকার নৈতিক কাপুরুষতার প্রতীক। এখন সময় এসেছে, প্রধানমন্ত্রী যেন ভারতের প্রতিনিধিত্বকারী ঐতিহ্যের পক্ষে স্পষ্ট ও সাহসী ভাষায় কথা বলেন। আজ গাজা ইস্যুতে, যা গোটা মানবতাবোধকে কাঁপিয়ে তুলেছে, গ্লোবাল সাউথ আবারও ভারতের নেতৃত্বের অপেক্ষায়। (পরিমার্জন ও অনুবাদ - শুভাশিস মজুমদার)

একটি প্রাচীন মন্দির ঘিরে যুদ্ধ থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়ার

মিলন দত্ত

গোটা বিশ্বজুড়ে নানা যুদ্ধের ভয়ানক আবহের মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দুটো শান্তিপূর্ণ দেশ কঠিন যুদ্ধ শুরু করেছে। থাইল্যান্ড আর কম্বোডিয়ার যুদ্ধে কেবল কামান বা রকেটের মতন ক্ষেপনাস্ত্রই ব্যবহার হচ্ছে না, দ্রোন এবং যুদ্ধবিমান থেকেও বোমা ফেলা হচ্ছে। থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়ার সীমান্তে সামরিক সংঘাতে কমপক্ষে ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে এক শতাধীরও বেশি সময় ধরে আসা বিরোধের তীব্রতা বাড়িয়ে তুলেছে এই সাম্প্রতিক সংঘর্ষ।

থাইল্যান্ডের সেনাবাহিনী জানিয়েছে, হতাহতদের বেশিরভাগই থাইল্যন্ডের তিনটি প্রদেশের অসামরিক নাগরিক। এই সংঘর্ষে হতাহতের বিষয়ে কম্বোডিয়ার অবশ্য এখনো কিছু জানায়নি। দুই পক্ষের মধ্যে ২৪ জুলাই সকালে গুলি বিনিময় শুরু হয়। দুই পক্ষেরই দাবি যে অন্য পক্ষ প্রথমে গুলি চালিয়েছে। একদিকে থাইল্যান্ড অভিযোগ তোলে কম্বোডিয়া তাদের লক্ষ্য করে রকেট নিক্ষেপ করছে। অন্যদিকে, কম্বোডিয়া অভিযোগ করে ব্যাংকক তাদের সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে বিমান হামলা চালাচ্ছে। এই চাপান-উতোড়কে কেন্দ্র করে বিষয়টা দ্রুত আরও গুরুতর হয়ে ওঠে। থাইল্যান্ড কম্বোডিয়ার সঙ্গে তার স্থলসীমান্ত বন্ধ করে দিয়েছে। দুই দেশই সীমান্তের নিকটবর্তী অঞ্চল থেকে নিজেদের নাগরিকদের অন্যত্র চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। থাইল্যান্ড অবশ্য ইতিমধ্যে ৪০ হাজার অসামরিক নাগরিককে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়েছে।

সাম্প্রতিকতম ঘটনার ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ দিয়েছে থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়া। থাইল্যান্ডের ন্যাশানাল সিকিউরিটি কাউন্সিল (এনএসসি) বা জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ দাবি করেছে, বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ৭টার পর কম্বোডিয়ার সামরিক বাহিনী সীমান্তের কাছে থাই সেনাদের ওপর নজরদারি চালাতে দ্রোন মোতায়েন করে। এর কিছুক্ষণ পরেই কম্বোডিয়ার সামরিক বাহিনী রকেট চালিত গ্রেনেড নিয়ে সীমান্তের কাছে জড়ো হয়। এই পরিস্থিতিতে থাই সৈন্যরা চিৎকার করে আলাপ-আলোচনার চেষ্টা করলেও তা ব্যর্থ হয়।

থাইল্যান্ডের ন্যাশানাল সিকিউরিটি কাউন্সিল মুখপাত্র জানিয়েছেন, কম্বোডিয়ার সৈন্যরা আটটা বেজে কুড়ি মিনিট নাগাদ তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়। এর পাল্টা জবাব দিতে বাধ্য হয় থাই সামরিক বাহিনী। থাইল্যান্ডের অভিযোগ, তাদের বিরুদ্ধে বিএম-২১ রকেট লঞ্চার এবং আর্টিলারিসহ মোতায়েন করা ভারী অস্ত্র ব্যবহার করেছিল কম্বোডিয়া। এর ফলে সীমান্তের থাই পক্ষে অবস্থিত একটা হাসপাতাল, একটা পেট্রোল স্টেশনসহ বাড়িঘর এবং সরকারি স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

কম্বোডিয়ার দাবি, সংঘর্ষের সূত্রপাত করেছে থাই সৈন্যরা। তারা জানিয়েছে, সকাল সাড়ে ৬টার দিকে সীমান্তের কাছে একটা খেমের-হিন্দু মন্দিরের দিকে অগ্রসর হয় এবং তার চারপাশে কাঁটাতার দেয় ঘিরে পূর্বের সমস্ত চুক্তি লঙ্ঘন করে থাই সেনাবাহিনী। কম্বোডিয়ার জাতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মুখপাত্র জানিয়েছেন, সকাল ৭টার পর থাই সেনারা একটা ড্রোন মোতায়েন করে এবং সকাল সাড়ে ৮টার দিকে শূন্যে গুলি ছোঁড়ে।

কম্বোডিয়ার ইংরেজি দৈনিক 'নমপেন পোস্ট' লিখেছে, ৮টা ৪৬ মিনিটে থাই সৈন্যরা প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে কম্বোডিয়ান সৈন্যদের ওপর গুলি চালায়। তাদের কাছে আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন, ভারী অস্ত্র ব্যবহার এবং কম্বোডিয়ার ভূখণ্ডে বিমান হামলার অভিযোগও করা হয়েছে।

কিন্তু থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়ার মধ্যে সংঘর্ষের কারণ কি? দুই দেশের মধ্যে এই বিরোধিতা একশো বছরেরও বেশি পুরনো। কম্বোডিয়া ফরাসিরা দখল করার পরে দুই দেশের মধ্যে এই সীমান্ত সৃষ্টি হয়। তার আগে পর্যন্ত দুই দেশের মধ্যে কোনও সীমান্ত ছিল না। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিস্থিতি খারাপ হতে থাকে ২০০৮ সালে। কম্বোডিয়ার ওই বিতর্কিত সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত একাদশ শতাধীর একটা মন্দিরকে ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসাবে নিবন্ধিত করার চেষ্টা করলে থাইল্যান্ড এই পদক্ষেপের তীব্র প্রতিবাদ জানায়। দীর্ঘদিন ধরে দুই দেশের মধ্যে মাঝেমাঝেই যে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ হয়েছে তাতে উভয় পক্ষের সৈন্য ও বেসামরিক নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে গত মে মাসে সংঘর্ষের সময় কম্বোডিয়ার এক সেনার মৃত্যুর পর দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা আরও বেড়ে যায়। এর ফলে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক গত দশ বছরেরও বেশি সময়ের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ পর্যায়ে নেমে আসে। গত দুই মাসে দুই দেশই একে অন্যের বিরুদ্ধে সীমান্ত নিয়ে নানা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। কম্বোডিয়া থাইল্যান্ড থেকে ফল ও সবজি আমদানি নিষিদ্ধ করেছে এবং বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট পরিষেবা আমদানি বন্ধ করে দিয়েছে। সম্প্রতি গত কয়েক সপ্তাহে দুই দেশই সীমান্তে নিজেদের সেনা উপস্থিতি আরও জোরদার করেছে।

আগেই বলেছি, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দুই প্রতিবেশির সীমান্ত বিবাদ পুরনো। প্রসাত তা মুয়েন থম নামে একাদশ শতাধীতে রাজা উদয়াদিত্য বর্মণ দ্বিতীয়ের অধীনে নির্মিত একটি খেমের হিন্দু মন্দির। মন্দিরটি শিবের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। এমারেল্ড ট্রায়াঙ্গেল (পান্না ত্রিভুজ) নামে পরিচিত ভূখণ্ডে মিলিত হয়েছে তিনটি দেশ; থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া ও লাওস। ঘন জঙ্গলে ঘেরা এই এলাকায় রয়েছে একাধিক প্রাচীন মন্দির। তাদের মধ্যে অন্যতম হাজার বছরের পুরনো ওই মন্দির। অনেকে মন্দিরটিকে প্রিয়া বিহার নামেও চেনে। এই মন্দিরের দখল ঘিরেই বারবার রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়েছে। ১৯০৭ সালে এই মন্দিরকে কম্বোডিয়ার অংশ বলে দেখানো হয় ম্যাপে। তখন দেশটি ছিল ফরাসি উপনিবেশ। পরবর্তীকালে সেটিকে নিজেদের বলে দাবি করে থাইল্যান্ড। ১৯৬২ সালে এই মন্দিরকে কম্বোডিয়ার অংশ বলে রায় দিয়েছিল ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিস। কিন্তু তারপরেও দুই দেশের সমস্যার নিষ্পত্তি হয়নি।

থাইল্যান্ডের ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী ফুমথাম ওয়েচায়াচাই জানিয়েছেন, কম্বোডিয়ার সঙ্গে তাদের বিরোধের বিষয়টা স্পর্শকাতর। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী এবং সতর্কতার সঙ্গে এর সমাধান করতে হবে। কম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী হুন মানেত জানিয়েছেন, তাঁর দেশ শান্তিপূর্ণভাবে এই বিরোধের সমাধান করতে চায়। তবে তিনি এও বলেছেন যে সশস্ত্র আগ্রাসনের জবাব সশস্ত্র শক্তি দিয়েই দিতে হয়। এছাড়া তাঁদের সামনে আর অন্য কোনো বিকল্প পথ খোলা নেই। বর্তমান সংঘর্ষ পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা কম বলে মনে হলেও উভয় দেশেই এই সংঘাত থেকে সরে আসার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী ও আত্মবিশ্বাসী নেতৃত্বের অভাব রয়েছে। (ঋণ বিবিসি, ইন্ডিয়া টুডে)।

কীভাবে ঠিক হবে দালাই লামার উত্তরসূরি

মিলন দত্ত

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, তিব্বতী বৌদ্ধ ভিক্ষুরা তীব্র অনুসন্ধান এবং পরবর্তী শিক্ষার পর দালাই লামাকে নির্বাচিত করে আসছেন। দালাই লামার মৃত্যুর পর তাঁদের চিরায়ত শিক্ষার মাধ্যমে নতুন দালাই লামাকে আসনে বসিয়েছেন। তিব্বতের আধ্যাত্মিক নেতা দালাই লামা তাঁর নব্বই তম জন্মদিনে স্পষ্ট করে বলেছেন, দালাই লামার উত্তরসূরি আসবে অর্থাৎ দালাই লামা নামক প্রতিষ্ঠানটি চলমান থাকবে এবং একমাত্র 'গাডেন ফোদ্রং ট্রাস্ট'-ই দালাই লামার উত্তসূরি মনোনয়ন এবং চিহ্নিতকরণের অধিকারী।

১৯৫৯ সালে তিব্বত থেকে ভারতে এসে আশ্রয় নেওয়ার পর থেকে নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী দালাই লামাকে বেইজিং বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে দেখে, আধ্যাত্মিক নেতার মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বেইজিং দ্রুত পাল্টা জবাব দেয় এবং জোর দিয়ে বলে যে, পরবর্তী দালাই লামা নির্বাচনের উপর তাদের ভেটো

রয়েছে। ৬৬ বছর ধরে ভারতে সম্মানীয় অতিথি হিসেবে বাস করার ফলে দালাই লামার প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যতের সঙ্গেও এ দেশের গভীর সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর থেকে প্রতিটি ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীকে দালাই লামা চেনেন। চিনের প্রতি এক কড়া বার্তায় ভারতের সংখ্যালঘু মন্ত্রী কিরেন রিজিজু সংবাদ সম্মেলনে বলেন, দালাই লামা ছাড়া অন্য কেউ পরবর্তী উত্তরসূরি নির্ধারণ করতে পারবেন না।

চতুর্দশ দালাই লামাকে কীভাবে নির্বাচিত করা হয়েছিল?

দালাই লামা হলেন তিব্বতি বৌদ্ধধর্মের গেলুগ ধারার আধ্যাত্মিক প্রধান। ঐতিহ্য অনুসারে, একজন প্রবীণ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর আত্মা তাঁর মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম লাভ করে। ১৪তম দালাই লামার জন্ম ৬ জুলাই, ১৯৩৫ সালে উত্তর-পূর্ব তিব্বতের একটি কৃষক পরিবারে। মাত্র দুই বছর বয়সে তাঁকে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছিল। দালাই লামার ওয়েবসাইট বলছে, তিব্বত সরকারের একটি অনুসন্ধান দল বেশ কয়েকটি লক্ষণের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত নেয়, যার মধ্যে একজন প্রবীণ সন্ন্যাসীর কাছে তাঁর দর্শন দেওয়ার ব্যাপারও আছে। অনুসন্ধান দলটি যখন ত্রয়োদশ দালাই লামার জিনিসপত্র তাঁর সামনে সাজিয়ে দেন, ওই শিশু তখন চিৎকার করে বলে, 'এটা আমার, এটা আমার'। ১৯৪০ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি, লামো ধোন্ডুপকে লাসার পোটালা প্রাসাদে নিয়ে যাওয়া হয় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে তিব্বতি জনগণের নেতা হিসেবে নিয়োগ করা হয়। দালাই লামা হওয়ার পর লামো ধোন্ডুপের নাম হয় তেনজিন গ্যাৎসো। এই তেনজিন গ্যাৎসোই আজকের চতুর্দশ দালাই লামা।

তাঁর উত্তরসূরিকে কীভাবে খুঁজে পাওয়া যাবে?

দালাই লামা সম্প্রতি বলেছেন যে তাঁর উত্তরসূরিকে 'চিরায়ত ঐতিহ্য অনুসারে' খুঁজে বের করা উচিত। ২০২৫ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত তাঁর বই 'ভয়েস ফর দ্য ভয়েসলেস'-এ দালাই লামা লিখেছেন, তাঁর উত্তরসূরি চিন বা চিন অধিকৃত তিব্বতের বাইরে কোনও স্বাধীন দেশে জন্মগ্রহণ করবেন। ১৯৫০ সালে তিব্বতের নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধারের জন্য চিনের কমিউনিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে ব্যর্থ বিদ্রোহের পর ভারতে পালিয়ে আসেন দালাই লামা। ১৯৫৯ সাল থেকে হিমাচল প্রদেশের ধর্মশালায় নির্বাসিত জীবনযাপন করছেন এই আধ্যাত্মিক নেতা। দালাই লামা ধর্মশালায় অবস্থিত তিব্বতি নির্বাসিত সংসদের প্রধানও ছিলেন, কিন্তু ২০১১ সালে তিনি তাঁর রাজনৈতিক নেতৃত্ব ত্যাগ করে শুধুমাত্র তাঁর আধ্যাত্মিক ভূমিকা বজায় রাখেন। তিনি ২০১৫ সালে 'দালাই লামার ঐতিহ্য ও প্রতিষ্ঠান অক্ষুন্ন রাখা এবং সমর্থন করার' জন্য গাদেন ফোদ্রাং ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বলেন যে, এই সংস্থাটি তাঁর উত্তরসূরিকে খুঁজে বের করার এবং স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য সম্পূর্ণরূপে অধিকারী। তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত শেষ ব্যক্তি হবেন কিনা তা নিয়ে বছরের পর বছর ধরে চলা জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটে দালাই লামার এই ঘোষণার মাধ্যমে। বর্তমান দালাই লামার পুনর্জন্মের সন্ধান কেবল তাঁর মৃত্যুর পর শুরু হবে। একজন নতুন দালাই লামাকে চিহ্নিত করতে এবং দায়িত্ব গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করতে বহু বছর সময় লাগতে পারে।

চিন কী বলে?

চিন বলেছে যে দালাই লামার উত্তরসূরিকে বাছাই করার অধিকার একমাত্র তাদেরই। তার অন্যথা হলে চিন বিরোধিতা করবে। দালাই লামা তাঁর বইতে, তিনি স্পষ্ট বলেছেন 'গণপ্রজাতন্ত্রী চিন সহ অন্য কারও দ্বারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নির্বাচিত দালাই লামাকে' গ্রহণ না করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। বেইজিং দালাই লামাকে নোবেল শান্তি বিজয়ী 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' হিসাবে চিহ্নিত করেছে। এমনকী তাঁর ছবি এবং তাঁর প্রতি জনসমক্ষে ভক্তি প্রকাশ নিষিদ্ধ করেছে। এই বছরের মার্চ মাসে, চিনা বিদেশ দফতরের এক মুখপাত্র দালাই লামাকে রাজনৈতিক নির্বাসিত বলে অভিহিত করেছেন; বলেছেন, তাঁর 'তিব্বতি জনগণের প্রতিনিধিত্ব করার কোনও অধিকার নেই'। তাদের বক্তব্য, দালাই লামার উত্তরসূরি খুঁজতে হবে চিনের অভ্যন্তরে। এবং তাতে অবশ্যই চিনের কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন থাকরে হবে। তিব্বতিদের ওপর দমন-পীড়ন চালানোর অভিযোগ বেইজিং অস্বীকার করেছে। চিনা প্রতিনিধি বলেন, দালাই লামার পুনর্জন্মের সঙ্গে একটি সোনার কলস জড়িত, যা ১৭৯৩ সালে তৈরি হয়েছিল, যখন কিং রাজবংশ দেশ শাসন করতো। চিনা কর্মকর্তারা বারবার বলেছেন, প্রক্রিয়াটি অবশ্যই চিনের জাতীয় আইন অনুসরণ করতে হবে, যেখানে সোনার কলসের ব্যবহার থাকবে এবং চিনের সীমান্তের মধ্যে থেকেই উত্তরসূরি নির্বাচন করতে হবে। দালাই লামার উত্তরসূরি খোঁজা নিয়ে চিনের এই বাড়াবাড়িকে তিব্বতিরা কিন্তু বেইজিং কর্তৃক তাদের সম্প্রদায়ের উপর প্রভাব বিস্তারের প্রচেষ্টা হিসেবে দেখছে। দালাই লামা নিজেই বলেছেন যে 'যারা ধর্ম প্রত্যাখ্যান করেছে সেই চিনা কমিউনিস্টদের লামাদের পুনর্জন্ম ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়।

ভারত ও আমেরিকা কী ভূমিকা পালন করতে পারে?

ভারতে দেড় লক্ষেরও বেশি তিব্বতী বৌদ্ধ বাস করেন, যারা এখানে স্বাধীনভাবে পড়াশোনা এবং কাজকর্ম করতে পারেন। ভারতীয়রা দালাই লামাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে, দেশে তাঁর উপস্থিতির ফলে চিনে তাঁর যে জটিল প্রতিদ্বন্দ্বিতা তৈরি হয়েছে তা নয়াদিল্লিকে এক ধরণের সুবিধা দিয়েছে। বিশ্বব্যাপী আধিপত্য বিস্তারের জন্য চিনের ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতার মুখোমুখি আমেরিকা তিব্বতীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমেরিকার আইন প্রণেতারা আগেই বলেছেন যে, তাঁরা দালাই লামার উত্তরসূরি নির্বাচনের ক্ষেত্রে চিনের হস্তক্ষেপ মানবেন না। ২০২৪ সালে, তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তিব্বতের বৃহত্তর স্বায়ত্তশাসনের দাবি আদায়ের জন্য বেইজিংকে চাপ দেওয়ার লক্ষ্যে একটি আইন পাস করেন।

অমর শহিদ মাতঙ্গিনী হাজরা

সোমনাথ সিংহ

(ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে আগষ্ট বিপ্লব ও অমর শহিদ মাতঙ্গিনী হাজরার নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে । ১৯৪২ সালের ৯ আগস্ট মধ্যরাত্রে মুম্বাই বা তৎকালীন বোম্বাই শহরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে ' ব্রিটিশ ভারত ছাড়ো ' প্রস্তাব (Quit India Resolution) গৃহীত হয় । মহাত্মা গান্ধি আহ্বান জানান ' করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' (Do Or Die) । ওইদিন ভোর রাত্রে মহাত্মা গান্ধি সহ প্রায় সমগ্র কংগ্রেস নেতৃত্বকে গ্রেপ্তার করা হয় ।

সারা দেশ জুড়ে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে । মেদিনীপুর জেলা বিশেষ করে তমলুক ও কাঁথি মহকুমা ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামে অগ্রগামি জেলা। তমলুক মহকুমার কংগ্রেস নেতৃত্ব যথা সতীশ সামন্ত, অজয় মুখার্জি , সুশীল ধারা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সিদ্ধান্ত নেন ২৯ সেপ্টেম্বর একই সঙ্গে তমলুক ও কাঁথি মহকুমার সমস্ত থানা গুলি হাজার হাজার মানুষকে নিয়ে অহিংস পদ্ধতিতে দখল করে নেওয়া হবে । ২৯ শে সেপ্টেম্বরের এই অভিযানের খবর ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগ ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি। এমনই ছিল সুনিপুণ পরিকল্পনা ।

তমলুক থানা অভিযানের পুরোভাগে ছিলেন বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী হাজরা। আগষ্ট বিপ্লবের ৭৩ বর্ষ পূর্তির প্রাক্কালে এই মহিয়সী নারীকে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি) প্রথম গুলিটা লাগলো বামহাতে, শরীর থরথর করে কাঁপছে .., তবু দেশের পতাকা মাটিতে স্পর্শ করতে দিলেন না। ডানহাত থেকে শাঁখটি মাটিতে পড়ে গেল... বামহাত থেকে ডানহাতে পতাকাটি নিলেন, শাঁখও তুললেন... উঁচুতে তুলে ধরে বললেন, ''বন্দেমাতরম''। এবারে গুলিকরা হলো ডানহাতে .. বসে পড়লেন মাটিতে ...সন্তানকে আঁকড়ে ধরে রাখার মতো সজোরে বুকে জড়িয়ে ধরলেন প্রিয় পতাকা। এবারে কাপুরুষ পুলিশ অফিসার অনিল ভট্টাচার্য্যের নির্দেশে ৭৩ বছরের বৃদ্ধার কপাল লক্ষ্য করে গুলি করল। ক্ষীণকণ্ঠে ''বন্দেমাতরম'' ... বলতেবলতে দেশমাতৃকার কোলে চিরনিদ্রায় শুয়ে পড়লেন আজন্ম-সেবিকা মাতঙ্গিনী হাজরা ... তাঁর লাল রক্তের ফোঁটায় ফোঁটায় ভিজে গেল ভবিষ্যত স্বাধীন দেশের মাটি।

১৮৬৯ সালের ১৭ই নভেম্বর, তমলুকের কাছে হোগলা গ্রামের মাইতি পরিবারে তাঁর জন্ম। যদিও তাঁর সঠিক জন্ম তারিখ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। বাবা ঠাকুরদাস মাইতি এবং মা ভগবতী দেবী'র (বিদ্যাসাগরের বাবা-মা'য়ের নামে ছিল তাঁর বাবা মা'য়ের নাম) তিনি ছিলেন ছোট কন্যা। মাত্র ১২ বছর বয়সে বাবা ঠাকুরদাস আদরের সুদর্শনা 'মাতু'র বিয়ে দিলেন পাশের আলিনান গ্রামের সম্পন্ন কৃষক ৬০ বছরের ত্রিলোচন হাজরার সাথে। এটি ছিল ত্রিলোচন বাবুর দ্বিতীয় বিয়ে। বিয়ের ছয় বছরের মাথায় ত্রিলোচন বাবু মারা যান। নিঃসন্তান অবস্থায় মাত্র ১৮ বছর বয়সে বিধবা হলেন মাতঙ্গিনী। এরপর যথারীতি স্বামীর সংসারে জায়গা না মেলায় পাশের এক জমিতে ঝুপড়ি কুটিরে আশ্রয় নেন। ধান ভাঁঙার কাজ করে নিজের জীবন চালাতে লাগলেন সদ্য বিধবা কিশোরী থেকে তরুণী মাতঙ্গিনী।

তরুণী অবস্থায় আত্ম-সুখ বিসর্জন দিয়ে বৈধব্য ব্রহ্মচর্য সাধনা শুরু করেন মাতঙ্গিনী হাজরা। দেশবাসীদের উদ্দেশ্যে বলা স্বামী বিবেকানন্দর একটি বক্তব্য বাল্য বিধবা মাতু'কে বিশেষভাবে স্পর্শ করেছিল; স্বামীজি বলেছিলেন -- ''এখন থেকে আগামী পঞ্চাশ বছর তোমাদের একমাত্র উপাস্য দেবতা হবেন জননী-জন্মভূমি। তাঁর পূজো করো সকলে... ।

তিনি উপলব্ধি করলেন দেশ ভারতবর্ষের মহান আদর্শ 'জনসেবা'। চেনা-অচেনা বিভিন্ন মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সেবা করতে করতে একসময় তাঁর যোগাযোগ হয় পাশের সিউরি গ্রামের কংগ্রেস নেতা গুণধর ভৌমিকের (বিজ্ঞানী মণিলাল ভৌমিকের বাবা) সাথে। সেই সূত্রেই পরিচয় হয় অজয় মুখোপাধ্যায় এবং সতীশ সামন্ত'র মতো দুই দিকপাল নেতৃত্বের সাথে।

তাঁদের মুখে মাতঙ্গিনী শুনলেন গান্ধীজীর কথা, তাঁর আদর্শ, ভাবনা ও আন্দোলনের কথা। তিনি গ্রামের পর গ্রাম ঘুরে ঘুরে স্বাধীনতার কথা, গান্ধীজীর কথা প্রচার করতে লাগলেন; সেইসাথে চলল দুঃখি, আর্ত-পীড়িত মানুষের সেবা কাজ। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করলেন দেশকে বিদেশীর শাসনমুক্ত করে দেশবাসীর মুখে হাসি ফোটানোর চেয়ে বড়ো ধর্ম আর কিছুই থাকতে পারে না। লোকে তাঁর নাম দিল 'গান্ধীবুড়ি'।

১৯২০ থেকে ১৯৪২ সাল - তিনি কংগ্রেসের প্রতিটি আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। যোগ দিয়েছিলেন অসংখ্য সভা সমিতিতে, প্রতিনিধি হয়ে গিয়েছিলেন অনেক কংগ্রেস সম্মেলনে, দিয়েছেন বক্তৃতা। লবণ সত্যাগ্রহ থেকে সরকারি কর বন্ধ আন্দোলন, আদালতে জাতীয় পতাকা তোলা, সামনে থেকে লাটসাহেব'কে কালো পতাকা দেখানো-সবেতেই জুটেছে পুলিশের নির্মম অত্যাচার, বহুবার খেটেছেন জেল। বিচারে কারাদণ্ডের রায় ঘোষণার পর মাতঙ্গিনী হাসিমুখে বলেছিলেন, ''দেশেরজন্য, দেশকে ভালোবাসার জন্য, দণ্ড ভোগ করার চেয়ে বড়ো গৌরব আর কী আছে.. ?'' তিনি বহরমপুর কারাগারে ছয়মাস বন্দি, হিজলি বন্দি নিবাসেও বন্দি ছিলেন দুই মাস।

আমাদের পড়াশোনার সাধারণ বই বা ইতিহাস বইতে মাতঙ্গিনী হাজরা'র আন্দোলনের কথা, আত্মত্যাগের কথা সে ভাবে লেখা নেই। মাতঙ্গিনী হাজরা কংগ্রেসের সদস্য পদ পেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি কোনও বিপ্লবী সংগঠনে দিক্ষিত ছিলেন না; বা সমাজের সার্বিক মুক্তিকামী কোনও সংগঠনের কর্মীও ছিলেন না। তিনি ছিলেন মূলত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী একজন নির্ভীক সৈনিক। মাতঙ্গিনী হাজরা ভারতের তৎকালীন কংগ্রেস নেতা গান্ধীর অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও অহিংস নীতির বদলে যেখানেই সহিংস আন্দোলন শুরু হয়েছে সেখানেই তিনি যোগ দিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, কোনও বাধ বিচার

করেননি। তাই মাতঙ্গিনী হাজরা'র মৃত্যু কোন আবেগসর্বস্ব করুণ পরিণতি নয়, তা ছিল আজন্ম দেশ ও জন সাধনার মোক্ষফল।

১৯৪২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর, বেলা তিনটে। জনতার মিছিল এগিয়ে চলছে তমলুক থানা ও দিওয়ানি আদালতের দিকে ... তমলুক শহরের চারটে প্রধান প্রবেশপথে সেই মিছিল আটকানোর জন্য মোতায়েন করা হয়েছে বিরাট ব্রিটিশ পুলিশ বাহিনী। বিপ্লবীদের মুখে স্লোগান, ''ইংরেজ ভারত ছাড়ো''... ''বন্দেমাতরম''।

মেদিনীপুরের তমলুক শহরের উত্তর দিকের গ্রাম হোগলা, আলিনান, জ্যামিট্যা, সোয়াদিঘি, খোসখানা, ডিমারী, বিশ্বাস, ধলহারা, মথুরি, সিউরি থেকে দলে দলে সাধারণ মানুষ রূপনারায়ণ নদের পাড় ধরে হেঁটে আসছে স্লোগান দিতে দিতে। পায়রাটুঙ্গি খালের কাছে দেওয়ানি কোর্টের পেছনে বিশাল ব্রিটিশ সেনাবাহিনী অহিংস জনতার মিছিলের পথ আটকে দাঁড়াল। আর এগোলেই গুলি করা হবে.. সঙ্গে চলল অকথ্য ভাষায় অপমানকর কথা আর অশ্রাব্য গালাগালি। ইংরেজ বন্দুকের সামনে তখন আগুনময় জনতা। হঠাৎই মথুরি গ্রামের ১৩ বছরের ছোট্ট রোগা বালক লক্ষ্মীনারায়ণ দাস ছুটে গিয়ে এক ব্রিটিশ পুলিশের হাত থেকে উত্তেজিত হয়ে ছিনিয়ে নিতে গেল নেট বন্দুক। সেই ছোট্ট বালককে পুলিশের বীরপুরুষরা বন্দুকের বাঁট আর বেয়োনেট দিয়ে থেঁতলে থেঁতলে খোঁচা মেরে মেরে খুন করে ফেলল। ছোট্ট ছেলেটির মৃত্যুযন্ত্রণার বুকচেরা চিৎকার-আর্তনাদে হঠাৎই জনতা হতবাক দিশেহারা হয়ে যায়..

তমলুক থানা দখল করতে গিয়ে ইংরেজ পুলিশের বন্দুকের সামনে যখন মিছিল ছত্রভঙ্গ, তখন নিজে এগিয়ে এসে মিছিল'কে সঙ্গবদ্ধ করে সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন ৭৩ বছরের মাতঙ্গিনী হাজরা। পিছিয়ে আসা জনতাকে আহ্বান করে বলেন,''থানা কোন্ দিকে? সামনে,না পেছনে?সামনে এগিয়েচলো .. হয় জয়,না হয় মরণ ..হয় এগিয়ে যাব, নয় মরব .. আমি সকলের আগে থাকব .. কেউ পিছিয়ে যেও না .. এসো ..আর যদি কেউ না আসো, তবে আমি একাই এই পতাকা নিয়ে এগিয়ে যাব .. তাতে যদি মরতে হয় মরব, এসো আমার সঙ্গে।''

এক নিঃস্ব নিরক্ষর গ্রাম্য নারীর দেশসেবা ও স্বাধীনতা আন্দোলনের অনিবার্য পরিণতি - ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ - তাঁর আত্মবলিদানের মধ্য দিয়ে ... ঐ দিন দুই হাতে দুটো গুলি লাগার পর .. তিন নম্বর গুলিটা তাঁর বাম চোখ দিয়ে ঢুকে মাথার খুলি ফাটিয়ে বেরিয়ে গেছিল.. !

সে দিন মাতঙ্গিনী হাজরা ছাড়াও ব্রিটিশের গুলিতে তমলুকের মাটি লাল হয়েছিল মথুরি গ্রামের লক্ষ্মীনারায়ণ দাস, দ্বারিবেরিয়ার পুরীমাধব প্রামাণিক, মাশুরির জীবনকৃষ্ণ বেরা, আলিনানের নগেন্দ্রনাথ সামন্ত, ঘটুয়ালের পূর্ণচন্দ্র মাইতি, তমলুকের নিরঞ্জন জানা, কিয়াখালির রামেশ্বর বেরা, হিজলবেড়িয়ার নিরঞ্জন পাখিয়াল, খনিকের উপেন্দ্রনাথ জানা ও ভূষণচন্দ্র জানা এবং নিকাশীর বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী-সহ বারোজন দেশপ্রেমিক শহিদের তাজা রক্তে।

আজ আমাদের প্রানের প্রিয় তেরঙ্গা পতাকার জন্মদিনে সেই সকল বিপ্লবীদের কেও শতকোটি প্রণাম যারা ভারতের স্বাধীনতার প্রতীক আমাদের তেরঙ্গা কে রক্ষা করার জন্য, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য সেদিন হাসতে হাসতে নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন ।

তথ্যসূত্রঃ পশ্চিমবঙ্গ দর্শন-মেদিনীপুর তরুণদেব ভট্টাচার্য । মেদিনীপুর সাহিত্য সংগ্রাম ইতিহাস সমিতি। বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী হাজরা রঞ্জনা অধিকারী।

এলোমেলা কথা

বাংলাদেশের জুলাই আন্দোলন এবং ফুকো

শুভ বসু

রাজনীতি , প্রতিবাদ এবং তার মধ্যে ইসলামের ভূমিকা নিয়ে ফরাসি সমাজতাত্ত্বিক মিচেল ফুকো ইরানের বিপ্লব প্রসঙ্গে অনেক গুলি প্রবন্ধ রচনা করেন ইতালির Corriere della sera পত্রিকাতে। তাঁর প্রথম প্রবন্ধ "The army– when the earth quakes–" প্রকাশিত হয় সেপ্টেম্বর মাসের ২৮ তারিখে ১৯৭৮ সালে। তাঁর দ্বিতীয়বার ইরান ভ্রমণের শেষে ফুকো তিনটে আরো প্রবন্ধ রচনা করেন যার মধ্যে শেষ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ফেব্রুয়ারী ২৬ , ১৯৭৯ সালে। সেই সময় শাহ ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন এবং আয়াতোল্লাহ খোমেইনী তেহরানে ফেরত এসেছেন এবং মেহেদী বাজারগান সেই সরকারের প্রধান। এর একমাস পরে মার্চ মাসের শেষে ইরিনা গণভোটের মাধ্যমে ইসলামী প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়। ফুকো তার এক মাস পরে মে মাসের ১১ -১২ তারিখে ১৯৭৯ সালে লে মন্দ সংবাদ পত্রে তাঁর শেষ রচনা লেখেন "Useless to revolt–" এর পরেও ফুকো বহু ইন্টারভিউ দেন এবং তাঁর শেষ ইন্টারভিউ প্রকাশিত হয় অগাস্ট ১৯৭৯ সালে।

ফুকো তাঁর প্রথম প্রবন্ধ থেকেই দাবি করেন ইসলাম হলো ক্ষমতার বিরোধী একে একটি জনগণের সম্মোহনী চুম্বক শক্তি হিসাবে দাবি করেছিলেন। সেই সময় ফেদাইন এ খাল্ক , মুজাহেদীন এ খাল্ক এবং টুডে পার্টিও গণ আন্দোলনে সামিল ছিলেন। এগুলি ছিল মার্ক্সবাদী বামপন্থী শক্তি। সামরিক বাহিনী ৮০ জন সামরিক পদস্থ কর্মচারীকে কমিউনিস্ট বলে হত্যা করেন যদিও ফুকো তাঁদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নি। তিনি সেই সময় দুটি তত্ত্ব প্রদান করেন। তার মধ্যে প্রথম তত্ত্ব হলো "spiritualité politique" বা বাংলা করলে মানে দাঁড়ায় রাজনৈতিক আধ্যাত্মবাদ। জার্মান মার্ক্সবাদী দার্শনিক আর্নস্ট ব্লক ''উটোপিয়ান হোপ'' বলে একটি তত্ব প্রদান করেন। তিনি বলেন যে মার্কসবাদে একটি উষ্ণ স্রোতের প্রয়োজন রয়েছে যা মানুষের আশার প্রতিফলন ঘটাবে। তাঁর কাছে মার্কসবাদকে মনে হয়েছিল তার আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষণ অনেক বেশি শীতল।

আর্নস্ট ব্লক এর তত্ব , যা প্রকাশিত হয় The Principle of Hope (৩ vols., ১৯৫৪-১৯৫৯), তাতে বলা হয় দ্বাদশ শতাধী থেকে ষোড়শ শতাধী পর্যন্ত ইউরোপে এ ধরণের ধর্মীয় বিপ্লবের কথা বলে হয়েছে। ক্রিস্টোফার হিল তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে ইংল্যান্ডের বিপ্লবে নিম্নবর্গের আন্দোলনে ধর্মের প্রভাব দেখেছিলেন। ই যে হবসবাউম মনে করতেন যে ঊনবিশ শতাধীর প্রাক রাজনৈতিক প্রতিরোধের মধ্যে একই আদিম প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ছিল। রণজিৎ গুহ তার এলিমেন্টারি আসপেক্টস অফ পিসান্ট ইন্সার্জেন্সি তে বিদ্রোহী কৃষক চৈতন্যে ধর্মীয় উপাদান এর কথা উলেখ করেছেন। তবে ফুকোর বিস্ময় ছিল অন্য জায়গায়। বিংশ শতকে যখন সারা পৃথিবী জুড়ে ধর্মীয় আন্দোলন বিবাহিনী ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যাচ্ছে সেখানে ইরানে ইসলামের সেখানে ইসলামের চিহ্ন (symbol) এবং ইসলামের তাত্বিক উপস্থিতি এবং ইসলামের পতাকার তলে একটি বিপ্লব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ফুকো একেই বলছেন "spiritualité politique" বা আধ্যাত্মবাদ . ফুকো বলছেন যে ইরানের ঐস্লামিক বিপ্লবীরা একটি “religious eschatology দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন যা তাঁদের একটি ঐস্লামিক নতুন দিগন্তের সন্ধান দিচ্ছিলো।ফুকো আলী শরীয়তির কথা বলছেন যিনি এই তত্ত্বের উপস্থাপনে করেন। religious eschatology র ধারণা যা খ্রিস্টীয় পরকাল বিদ্যা র সঙ্গে জড়িত। Reinhart Koselleck বলে এক জার্মান দার্শনিক বলেন ষোড়শ শতাধী থেকে ইউরোপে religious eschatology ধারণা মৃত্যু বরণ করেছে। আসলে ফুকোর প্রতিবাদ ছিল মার্কিন হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে । দ্বিতীয়ত ফুকো মনে করতেন যে ইউরোপে বিংশ শতকে রাষ্ট্র পরিচালনা হয়ে গেছে একধরণের প্রযুক্তি। ঐতিহাসিক মুহাম্মদ তাভ্যাকলি এঁদের সম্পর্কে বলেন যে এঁরা hate mystcism প্রচার করেন। ইরানি ঐতিহাসিক বেহরুজ ঘামারী -তাব্রিজি ঘামারী -তাব্রিজি বলেন ফুকো ইরানের বিপ্লবে antiteleological দর্শনের সন্ধান করেছিলেন। কারণ এই বিপ্লব ছিল প্রচলিত প্রতীচ্যের প্রগতিশীল ঘরানার বাইরে। Behrooz Ghamari-Tabrizi– Foucault in Iran Islamic Revolution after the Enlightenment SUniversity of Minnesota Press– ২০১৬), ফুকোর ইরানের বিপ্লবের ক্ষত্রে প্রতিক্রিয়া হলো সত্যর সঙ্গে অধ্যাত্মবাদের যোগ নিয়ে। এই প্রসঙ্গে ফুকো দ্বিতীয় তত্ত্বের উপস্থাপনে করেন যা হলো “contreéôéconduite । ফুকো বিদ্রোহ , প্রতিবাদ ভিন্নমত;, অবাধ্যতা বর্জন করেন কারণ তিনি মনে করতেন এই শধগুলি খুবই দুর্বল , স্থানীকৃত নিষ্ক্রিয় . ফুকো তাঁর তত্ত্ব কে বলেন theoretical ethic” “ëy £öìœy òantistrategic’ যা ক্ষমতার শাশ্বত ধারণার পরিপন্থী।

বাংলাদেশের জুলাই আন্দোলন কি ইসলামের সামগ্রিক উপস্থিতিতে হয়েছিল। তার লক্ষ্য কি ছিল ঐস্লামিক রাষ্ট্র স্থাপনা? বাংলাদেশের ঐতিহাসিক পটভূমিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছিল এই আন্দোলনের সমর্থক। অধ্যাপক ইউনুস কি কুতুব, খোমেনী এবং মওদুদীর তত্ত্বর দ্বারা অনুপ্রাণিত? জামাতে ইসলামী নিঃসন্দেহে মওদুদীর অনুসারী। বাংলাদেশের জুলাই আন্দোলন মধ্যপ্রাচ্যে যে আরব বসন্ত এসেছিলো রাষ্ট্রপতি ওবামার উৎসাহে তার সঙ্গে তুলনীয়। আমার তো মনে হয় না প্রতীচ্যের পরিবর্তে একটি সামগ্রিক ইসলামী সত্যের উপস্থাপন এই আন্দোলনের লক্ষ। ইউনুস সাহেব আর যাই হন আলী শরীয়তির মতো প্রতিবাদী দার্শনিক নন যিনি প্যাট্রিস লুলুম্বা , ফানোঁ , Louis Massignon এবং জা পল সাত্রের দ্বারা অনুপ্রাণিত। ইউনুস সাহেব একজন আন্তর্জাতিক মানের সফল টেকনোক্র্যাট। কাজেই ফুকোর তত্ত্ব spiritualité politique বাংলাদেশের জুলাই আন্দোলন ক্ষেত্রে প্রয়োগ না করাই ভালো।

(আমার এই লেখা অধ্যাপক আল মামুনের একটি প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে লেখা। আর আমি আর সব বাংলাভাষী বুদ্ধিজীবীর মতো মনে করি একো ফুকো দেরিদা লাঁকা চতুর্বিনা মগজ ফাঁকা।)

বাংলাদেশ কোন পথে

হা চিত্ত, হা মন কিছু স্মৃতি, কিছু বেদনা

ভুঁইয়া সফিকুল ইসলাম

মাঝে মাঝে মনটা অসহ হয়ে ওঠে। জীবনের প্রায় পুরাটা কাটিয়ে দেওয়া এই ঢাকাকে আর আমার মনে হয় না। প্রেমহীন ক্ষমতালোভী মানুষের দাপট দেখতে দেখতে ক্লান্ত!

লণ্ডনে চলে যাই ছোটো মেয়ের কাছে। পরপর দুটি কন্যা জন্মের পর, কে আর বাচ্চা নেয়? তবুও পৌড় বয়সে ও এল। মেয়েটি গ্রাজুয়েশন শেষ করে লণ্ডনে চাকরি নেয়। কঠিন চাকরি, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির ফিনানশিয়াল এনালিস্ট।

বাইশ পেরতেই চাকরি। ছোট্ট মেয়ে দূর ভুবনে। সকাল-সন্ধ্যা অফিসে কঠোর শ্রম, কঠোর জীবন। সাহিত্য তার নেশা, তার সাথে চলে চার্টার্ড ফাইন্যানশিয়াল এনালিস্ট হওয়ার জন্য একাডেমিক পড়াশোনা।কী যে কষ্ট করে মামনি! সে এক রক্তক্ষরা সংগ্রাম।

মেয়েটাকে বলি, চল বাড়ি, দেশে ফের। এত টাকার দরকার নেই মা! তোর এই কষ্ট আমি দেখতে পারি না। গম্ভীর প্রকৃতির মেয়েটি নিস্পাপ একটু হাসি হাসে। না বাবা, দেশে তো টিকতে পারব না। দেশের যে অবস্থা! বেরতে ভয় পাবো। একটি মেয়ে প্যান্ট পরে বের হচ্ছে, তো দাড়িপাকা টুপিমাথা সিনিয়র সিটিজেন তার উপর হামলে পড়ছে। কেউ একজন পিছন থেকে তার প্যান্টে পানের পিক ছুড়ে দিচ্ছে। মাথায় টিপ পরার দায়ে পুলিশ অশোভন উক্তি করছে। এই দেশে কেমনে থাকব বাবা? একটি পথকুকুরও দেশে নিরাপদ নয়, বৃদ্ধ দাড়ি-টুপি সিনিয়র নাগরিক কুকুরগুলি ধাইয়ে মারছে। ও কার শত্রু বাবা! কেন ওকে মারে?

আমার মেয়েটির চোখ ধরে আসে। ও খুব পশুপ্রেমী। রুগ্‌ণ কুকুর ছানা, বিড়াল ছানা বাসায় এনে পুশত। পথের কুকুরদের খাওয়াত। নামও দিয়েছিল কুকুরগুলির। ও স্কুলে যাওয়ার সময় কুকুরেরা ছুটে আসত ওর আদর নিতে, মমতা দিতে। আমার মেয়েটি এখন জানতে পেরেছে, কুকুর মারা মুসলমানের একটা পবিত্র কাজ!

মেয়ের তালিকায় আরো বেদনার সাথে যোগ হয় সমসাময়িক মবের দৌরত্ব, গ্যাং রেপ , ধর্মশালায় শিশু নির্যাতন, প্রকাশ্য দিবালোকে মানুষকে পিটিয়ে খুন। আমার যে মেয়ে প্রত্যহ মায়ের সঙ্গে ফোনালাপ না করলে বাঁচতে পারে না, সে মাতৃভূমি ছেড়ে কেমন দূর বিদেশ বেছে নেয়! বলে, আমার দেশে হয় তো এত বেতন পাবো না, গবির দেশে, মাসে আট/ন লাখ টাকা বেতন কে দেবে। কিন্তু সেখানে যদি একটি লাখও বেতন পেতাম, সম্মনজনক একটু বেঁচে থাকা, তবে ফিরতাম। এখানে মেধা বলে যায়গা পাওয়া যায়। আমার দেশ সে আস্থা হারিয়েছে। তাছাড়া লন্ডন আমার ধর্ম-পরিচয় জানতে চায় না, আমার পোশাক নিয়ে কোথাও কটুক্তি করে না। তোমাদের ছাড়া আমি একাকীত্বে ভূগি, কিন্তু ভেবে দেখেছি, দেশে আমি টিকতে পারব না। তোমরা বরং চলে আসো।

আমরা যতদিন থাকি ও ভালো থাকে। একটি রুম, মোটামুটি বড়ো। নিচে বিছানা পেতে আমি থাকি। ও মাকে নিয়ে শিশুর মতো আচরণ, খুনশুটি করতে করতে ঘুমিয়ে যায়। কিন্তু আমরা যখন ফিরে আসি, ওর চোখে মেঘ জমে। ইয়ারপোর্ট থেকে ছলছল চোখে ফিরে যায়। আমরাও চোখ মুছে, বিমানবন্দরে ঢুকে পড়ি।

একটি রুম তো ওর, একটি দু রুমের ফ্লাট কিনবে, কিন্তু লন্ডনে সে অনেক দাম। টাকা গুছাচ্ছে মাসে মাসে, একদিন সে কিনবে, আমাদের কাছে রাখবেই!

মনে মনে বলি, একটি ছোটো স্বপ্ন নিয়ে ও বেঁচে থাক। কিন্তু আমরা কেমনে এই লন্ডনে দীর্ঘদিন থাকব? যে দেশের আলো-হাওয়ায় বেড়ে উঠেছি। আমার মাতৃরূপিনী সোনার বাংলা, মুক্তি যুদ্ধের বাঙ্কারে বসেও যেখানে অন্তর গুনগুন করে গাইত, 'তোমাতে বিশ্বময়ী, বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা', বাগেরহাটের চরকুলিয়ার উঁচু খালপাড়, দু পাশে ঘন বন, বাঁশঝাড়, সন্ধ্যায় ঝিঁঝিপোকা, গোলার আওয়াজে পাখিরা তখন উড়ে গিয়েছিল। হায়েনারা মর্টার আর মেশিনগান ছুড়ত। ওরা মোল্লাহাট থেকে কাহালপুর হয়ে আসত। সে সময় আমরাও শত্রুদর্প চূর্ণকারী আগুন ঝরা জবাব দিতে দিতে এগোতাম। সেই বাংলা ছেড়ে আমি চলে যাবো? বিদেশে কবরস্তানে ঘুমাব?

চরকুলিয়ার পেছনে আমাদের গ্রাম। মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ হতো আমাদের স্কুলমাঠে। স্কুলে ছিল মুক্তিযোদ্ধার ক্যাম্প। তাই আমাদের গ্রাম পুড়িয়ে দেওয়ার টার্গেট করে খুলনা থেকে বিশাল বাহিনী নিয়ে যেবার পাকসেনারা এল, গুলির পরে গুলিতে রাতে বুলেটজোনাকী দেখে ভয় পেয়ে প্রকৃতির ক্ষুদ্রপ্রাণ জোনাকীরা লুকাল, সেদিনগুলোতে আমার এবং আমাদের মায়েদের ভীতির কথা মনে পড়ে। তাঁরা জানতেন, সম্মুখ সারিতে আমরা পরাজিত হলে তাঁরা নিগ্রিহীত হবেন। খাবার দাবার ঘরদোর সব আগুনে যাবে। গোআলের গরুগুলো ধরে নিয়ে খেয়ে ফেলবে। ধানের গোলা জ্বলবে।

মা বুদ্ধি করে কয়েক কলস চাল বাগানে নিয়ে পুতে রাখলেন। লেপ কাঁথা বালিশও কিছু কিছু। গ্রামের অনেকেই ওই কাজ করলেন। তখন বিলভরা জল, বর্ষাকাল। মেয়েরা প্রস্তুত হয়ে থাকলেন, বর্ষার বিলে জেগে থাকা পাটক্ষেতে নাকভাসিয়ে লুকিয়ে থাকবেন, যদি পাকসেনা আর রাজাকার এসে পড়ে। আমার মায়ের ছিল জোঁকের ভয়। পানিতে শুধু জোঁক। মা-র মন খাবাপ। বললেন তিনি বাড়ির পুবদিকে নানির কবরের গাছে যে লতাঝোপ, বাঁশবাগান, সেখানেই থাকবেন। অত জোঁকের মুখে পড়বেন না।

এমন পরিস্থিতিতে, ১৭ বছরের আমি। কবি-কিশোর সুকান্তের কবিতা পড়ে শপথ নিলাম, আর নয় হে পাক সেনা, হে হায়ানা রাজাকার!

'প্রিয়ারে আমার কেড়েছিস তুই ভেঙেছিস ঘর বাড়ি,
সে-কথা কি আমি জীবনে মরণে কখনো ভুলিতে পারি?
আদিম হিংস্র মানিবকতার যদি আমি কেউ হই
স্বজনহারা এ শ্মশানে তোদের চিতা আমি তুলবই।'

সে-যুদ্ধে আমরা পাকি-রাজাকারদের আমাদের মাতার গায়ে হাত দেওয়ার সুযোগ দেই নি। চরকুলিয়ার রনাঙ্গনেও তারা খুব একটা ঢুকতে পারেনি। আমাদের অগ্রবর্তীবাহিনীর বীরোচিত গেরিলা হামলায়, কাহালপুর ব্রিজের কাছেই ওদের যুদ্ধের সাধ মিটে যায়। ওদের কমান্ডার বিশালদেহী পাঞ্জাবী মেজর সেলিমও নিহত হয়। তারপর থেকে মোল্লাহাট ছিল স্বাধীন।

আমাদের যুদ্ধ ছিল সমগ্র জাতির সর্বাত্মক যুদ্ধ। প্রতিটি যুদ্ধেই অস্ত্রের পাশে সাংস্কৃতিক অস্ত্র গভীর ভূমিকা রাখে। আমাদের জাতীয় গৌবর, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সুকান্ত, জীবনানন্দ সেই বিদেহী অমৃতলোক থেকে তাদের সাধের বাংলাকে রক্ষা করতে আমাদের পাশে ছিলেন। তাঁদের কবিতা-সংগীতের সাংস্কৃতিক সম্পদের সামনে, গনিমতলোভী রাজাকার-পাকসেনাদের তকবির ধ্বনি সেদিন বিশ্ববিধাতার কাছ থেকে অভিশাপ হয়ে ফিরে আসে। চার লক্ষ বাঙালি মেয়েকে নৃশংস ধর্ষণ-হত্যার গনিমতি দর্শন সেদিন সুকান্তের কবিতার কাছে হার মানে।

আমি তো এর সাক্ষি। আমি তো এর রূপকার। এই রক্তঝরা দেশে এখনো আমি বিপন্ন মা-বোনের মরণচিৎকার শুনতে পাই। আমি কেমনে কন্যার ডাকে সাড়া দিয়ে লন্ডন বসে থাকি? ওর কষ্টের টাকায় কেনা ব্রেড-বাটার খাই? সকালে মুড়ি-চানার নাস্তাই যে আমার অমৃত! সাথে এক পেয়ালা মশলা চা।

আমার বড়ো মেয়ে কানাডায় বাড়ি করেছে। বড়ো বাড়ি। ওরা একতলা আমাদের ছেড়ে দিতে চায়। বৃদ্ধ বয়সে কেন এই মবের দেশে মৃত্যু-ঝুঁকিতে থাকব!

কিন্তু মা-মনি বোঝে না, এদেশ আমার স্বপ্ন। প্রত্যহ আমার চোখের সামেন জ্বলজ্বল করে চরকুলিয়ার যুদ্ধের দিন, আমার চোখের সামনে দিয়ে চলে রাইফেল হাতে সারি সারি মুক্তিযোদ্ধা। এ চোখে বিজয়ে প্রত্যয় ছাড়া আর কিছু কি মানায়?

আমি আজ যখন দেখছি মুক্তিযুদ্ধের অপমান, মুক্তিযোদ্ধার গলার জুতার মালা, নবিকে কথিত কটুক্তির দায়ে বৃদ্ধ স্কুলশিক্ষককে হৃদয়হীন অপমান, পাদুকা প্রহার; আমি যখন দেখি এই বাংলার আদি ভূমিপুত্র, যার প্রাণের মধ্যে জীবনানন্দের গুঞ্জন, রাবীন্দ্রিক উদার মানবিক দর্শন, উপনিষদের অহিংস সর্বমানবের হীতব্রতবাহী সেই হিন্দু ভাইদের উপর লাঞ্ছনা, আমি মুসড়ে পড়ি। আমার সহযোদ্ধা, আমার সংস্কৃতির প্রধান অংশীদার, যে তবলা না বাজালে, সেতারে তান না তুললে, আমার গান হয় না, বাংলামায়ের বন্দনা হয় না, আমার সে হিন্দু ভাই বিনা দোষে মার খাচ্ছে, তখন আমার বেঁচে থাকার সাধ মিটে যায়। আমার যে বোন সন্ধ্যাপ্রদীপ হাতে তুলসীতলায় দেবতাকে প্রণাম দিতে গিয়ে ধর্ষকের ভয়ে ভীত হয়ে এদিক-ওদিক তাকায়, সে-চাহুনি আমার মর্মে এসে বিঁধে।

আমার ভাইদের হৃদয়ের তুলিতে গড়া দেবী মূর্তিতে অর্বাচীন মুসলিম আজ লাথিও মারছে, প্রসাব করছে। মুক্তিযুদ্ধে সর্বোচ্চ ত্যাগের বিনিময়ে এই তাদের প্রাপ্তি ! করছে তারাই যারা সাম্যের কথা বলে, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের কথা বলে ! আর ধর্ষক পাকিস্তানকে বলে, 'মেলায় হারিয়ে যাওয়া হারানো ভাই।' তাদেরকেই বুকে আলিঙ্গন করে নেয়। আর দেশের আদিপুত্র, সুনাগরিক, শিক্ষায় ভব্যতায় সংস্কৃতিতে এগিয়ে থাকা হিন্দু ভাইদের দেশ ছাড়া করতে চায়।

সত্যি বলতে কি যে-ইসলামের মধ্য আমার জন্ম, সে ইসলাম কে এরা আমার কাছে বিভীষিকাতে পরিণত করেছে। আল্লার ধর্ম এতটা হিংসাপরায়ন, অমানবিক হতে পারে, আল্লার সৃষ্ট মানুষকে এতটা অপমান করতে পারে? এই যখন দেখি, তখন মনে মনে বলি, এ কার ধর্ম? বলি, প্রভু আমাকে মুসলমানের ঘরে জন্ম না দিয়ে অরণ্যচারী একটি কাঠবিড়ালি করে জন্ম দিলেও খুশি হতাম।

ধিক আমার এই মানব জন্ম।

আমি কোথায় যাবো ?

(লেখক একজন মুক্তিযোদ্ধা। বাংলাদেশ সরকারের. অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিক। সততা ও স্পষ্টবাদীতার জন্য অনেকের অপছন্দের মানুষ।)

কলকাতার বায়ুদূষণ নিয়ে আমরা কি আদৌ চিন্তিত

রাহুল রায়

পনেরো বছরের পুরানো বাণিজ্যিক গাড়ি বাতিলের যে বিষয়টি ছিল, সাম্প্রতিককালে রাজ্য সরকারের পুনর্বিবেচনায় তাদের আরও দু'বছরের জন্য অর্থাৎ যে বাণিজ্যিক গাড়ির বয়স ১৫ বছর পেরিয়েছে, তাকে ১৭ বছরের জন্য রাস্তায় চলতে দিতে সরকারের আপত্তি নেই। এই বিষয়টি কলকাতা উচ্চ আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। রাজ্য সরকারও একে সমর্থন করছে। ১৫ বছরের পুরানো এই সব বাণিজ্যিক গাড়ির মালিকদের কলকাতা এবং তার আশেপাশে আরো দু'বছর দূষণ ছড়াবার জন্য এক ধরনের আইনি স্বীকৃতিদানে রাজ্য সরকার কেন যে এগিয়ে এল সেটাই মানুষের কাছে বিস্ময়ের।

বিষয়বস্তুটির গভীরতা বোঝার জন্য আমাদের একটু ফিরে যেতে হয় ২০০৮ সালে। ভারতের শীর্ষ আদালত ২০০৮ সালে তাদের এক নির্দেশনামায় দিল্লির সমস্ত ১৫ বছরের পুরানো পেট্রোল-চালিত এবং ডিজেল-চালিত বাণিজ্যিক গাড়ি বাতিল করে দিয়ে বলেছিল যে, এগুলি রাস্তায় আর চলতে পারবে না। এই আদেশনামাটি নিয়ে যথেষ্ট বিক্ষোভ হলেও দিল্লির তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী এটিকে কার্যকরী করেছিলেন। পরবর্তীকালে এই একই পদ্ধতি মেনে মুম্বাই উচ্চ আদালতও একই নির্দেশ দিল যে, ১৫ বছরের পুরনো বাণিজ্যিক গাড়ি মুম্বাই-এর রাস্তায় আর নামতে পারবে না, কারণ বায়ুদূষণ ঊর্ধ্বমুখী। এবার এল কলকাতার পালা। কলকাতাতে যখন এই বিষয়টি নিয়ে টানাপোড়েন চলছে, সেই প্রেক্ষাপটটা একটু জানা দরকার।

২০০৬ সালে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের মুখ্য আইনাধিকারিক বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়কে পর্ষদ থেকে সরিয়ে রাইটার্স বিল্ডিংস-এ বসিয়ে দেওয়া হল। কারণ, বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায় মন্দারমনি, কলকাতার বহুতল আবাসন সহ আরও অনেক বেআইনি কাজে মারাত্মক বিরোধিতা করছিলেন। এমনকি শান্তিনিকেতনের খোয়াই বাঁচাতেও তৎকালীন সরকারের রোষানলে পড়েছিলেন। রাইটার্সে বসেই বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায় ভাবতে শুরু করলেন, কীভাবে কলকাতার দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এই নিয়ে তাঁর ভাবনায় প্রথমেই উঠে এল মহানগরীর যানদূষণ। কারণ সেই সময়ে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা গিয়েছিল যে, কলকাতার বুকে যে দূষণ ঘটছে, তার সিংহভাগের জন্য দায়ী যানদূষণ। এই যানদূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন রকম মামলা শুরু হল। পরিবেশকর্মী সুভাষ দত্ত কলকাতা উচ্চ আদালতে মামলা করে বললেন, কলকাতার বুকে হয় ১৫ বছরের পুরানো বাণিজ্যিক গাড়ি বাতিল হোক, অথবা এমন কিছু ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করুক যাতে এই যানদূষণ কমানো যায়।

রাজ্য সরকারের পরিবেশ দপ্তরের থেকে এই বিষয়বস্তুটি খতিয়ে দেখার দায়িত্ব পড়ল বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়ের ওপর। বিশ্বজিৎ

মুখোপাধ্যায় ভেবেচিন্তে পরিবেশ দপ্তরের পক্ষ থেকে একটি অর্ডার তৈরি করলেন। বিতর্ক তুঙ্গে তখন। সেই সময়ে পরিবহন দপ্তর চাইছিল না যে রাস্তা থেকে ১৫ বছরের পুরনো বাণিজ্যিক গাড়ি এবং অটো তুলে নেওয়া হোক। কারণ তখন প্রায় সমস্ত পুরানো বাণিজ্যিক গাড়ি ডিজেল-এ চলে। সমস্ত অটোই ডিজেল এবং কাটা তেল (ডিজেলের সঙ্গে কেরোসিন মিশিয়ে)-এ চলে। এতে মারাত্মক বায়ুদূষণ ঘটে।

বিশ্বজিৎ বাবুর তৈরি করা অর্ডারটি পরিবেশ দপ্তরে পেশ করা হল এবং সেটি মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত গেল। মুখ্যমন্ত্রী অর্ডারটি দেখে তাতে সায় দিয়ে বললেন, না, এভাবে কলকাতার দূষণ চলতে দেওয়া যায় না। কলকাতার বায়ুদূষণ কমানো অত্যন্ত জরুরি। তো বিশ্বজিৎ বাবুর তৈরি করা এই অর্ডারে কী ছিল? এই অর্ডারে ছিল ১৫ বছরের পুরানো যাবতীয় বাণিজ্যিক গাড়ি বাতিল করতে হবে কয়েক মাসের মধ্যে। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি এই অর্ডারে বলা হল, এই পুরানো গাড়িগুলি যে সমস্ত কেন্দ্র থেকে 'পলিউশন আন্ডার কন্ট্রোল' (পিইউসি) ছাড়পত্র নেয়, সেই সমস্ত কেন্দ্রগুলিকেও দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের আওতায় এনে তারা যাতে সঠিকভাবে ছাড়পত্র দেয়, তার নিয়ন্ত্রণও করবে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ। সেখানে কোনরকম গোলমাল দেখা দিলে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং প্রয়োজনে তাদের জরিমানা করা যাবে।

২০০৮ সালের ১৬ জুলাই বিকেলবেলা রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর অনুমোদন নিয়ে এই অর্ডারটি বের করা হয় যাতে কাকপক্ষীও টের না পায় যে কী হতে চলেছে। এর পরের দিন কলকাতা উচ্চ আদালতে শুনানি। এই অর্ডারটি পরের দিন কলকাতা উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতির হাতে পরিবেশ দপ্তরের পক্ষ থেকে তুলে দিয়ে বলা হল, এই অর্ডারটি জারি করা হয়েছে যাতে ১৫ বছরের পুরানো বাণিজ্যিক গাড়ি বাতিল করা হয়েছে এবং তৎসহ আরও কয়েকটি নির্দেশ জারি করা হয়েছে। অর্ডারের কপিটি প্রধান বিচারপতি সুভাষ দত্ত-এর হাতে দিয়ে জানতে চাইলেন, এতে আপনি কি রাজি আছেন? সুভাষ তত্ত্ব জানালেন, তিনি ভাবতেই পারছেন না যে এরকম একটি বাস্তবোচিত অর্ডার হতে পারে! বললেন, আমার আবেদনেও এত কিছু বলা ছিল না। এই অর্ডারটি নিয়ে আমি সম্পূর্ণ একমত। এই অর্ডারটিকে কার্যকরী করা হোক।

আর কোন বিলম্ব হল না। কলকাতা উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি সঙ্গে সঙ্গেই এই অর্ডারটিকে কলকাতা উচ্চ আদালতের ১৭ জুলাই ২০০৮ সালের আদেশনামা হিসেবে ঘোষণা করে দিলেন। প্রধান বিচারপতি এও বললেন, উচ্চ আদালতের অনুমোদন ছাড়া এই অর্ডারের কোনরকম পরিবর্তন করা যাবে না। ১৫ বছরের পুরানো বাণিজ্যিক গাড়ির লাইসেন্স বাতিল করার দায়িত্ব থাকল রাজ্য সরকারের পরিবহন দপ্তর এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের উপর।

এই অর্ডার বেরোনোর পরে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে হাজার খানেক অটোচালক অটো নিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। তখন কলকাতার রাস্তায় হাজার হাজার লাইসেন্সবিহীন বেআইনি অটো চলত। আর এই ছবি শুধু কলকাতার ছিল না, পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই একই ঘটনা। সবচেয়ে বেশি এই বেআইনি অটো চলত উত্তর এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলাতে। অটোচালকদের এই বিক্ষোভে তদানীন্তন বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি অক্সিজেন জোগাতে মাঠে নেমে পড়ল। কিন্তু সরকার অনড় থাকল। সরকার দৃঢ়ভাবে জানিয়েছিল, না, কলকাতা উচ্চ আদালত যখন এই অর্ডারটি দিয়েছে, তখন একে কোনওভাবেই বদলানো যাবে না। এটিকে কার্যকরী করতেই হবে। এরপর সমস্ত অটোকে বাতিল করা হল। তাদের আর্থিক সাহায্য করা হল। ডিজেল ও কাটাতেলে চলা দূষণ সৃষ্টিকারী এই অটোগুলি ক্রমশ প্রাকৃতিক গ্যাস-চালিত হল। ফলত কলকাতা সহ সমস্ত বৃহত্তর শহরতলিতে এক পরিবর্তন হল। বায়ুদূষণের মাত্রা অনেকটাই নেমে এল। কলকাতার মানুষ অনেকটা স্বস্তি পেলেন। ক্রমশ রাজ্যের বিভিন্ন জেলাতেও এই ঘটনা ঘটলো।

এরপর ২০১১ সালে রাজ্যে নতুন সরকার এল। নতুন সরকার এই বিষয়টিতে ততটা মনোযোগী হল না। ১৫ বছরের পুরানো বাণিজ্যিক গাড়ি বাতিলের ব্যাপারে তারা নানা চিন্তাভাবনা শুরু করল। বাতিল করাটা ঠিক না বেঠিক, তা নিয়ে নানা প্রশ্ন তুলল। এসবে অনেকটা সময় গড়িয়ে গেল। এরই মধ্যে অবশ্য একটা পরিবর্তন ঘটে গেল। অটো নিয়ে নানান টানাপোড়েনের মধ্যেই রাস্তায় নামল ব্যাটারি-চালিত দূষণহীন টোটো। এর কোন লাইসেন্স নেই। রাজ্যের সমস্ত শহর ও গ্রামে টোটো ছেয়ে গেল। এই টোটোর আগমনের সঙ্গেই আর একটি বিষয় ঘটে গেল যেটি সরকার এর তরফে এখনও নিয়ন্ত্রণ করা হল না -- তা হল ভ্যানো। ভ্যানো-এর বিরুদ্ধেও ২০০৮ সালে অর্ডার বেরিয়েছিল যে, ভয়ানক দূষণ সৃষ্টিকারী ভ্যানোকেও বাতিল করতে হবে। কিন্তু পরিবহন দপ্তরের তরফ থেকে একটি অর্ডার বের করে বেআইনি ভাবে বলা হল, ভ্যানোকে পঞ্চায়েত এলাকায় চালানো যাবে।

শেষে এ কথা বলা যায় যে, আজকের দিনে ১৫ বছরের পুরানো এই বাণিজ্যিক গাড়িগুলিকে আবার রাস্তায় নামার অনুমতি দিলে কলকাতার বায়ুদূষণ মাত্রা আরও বেড়ে মানুষের নাভিশ্বাস উঠবে। কলকাতার দূষণ কমানোর ক্ষেত্রে আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু ২০০৮-০৯ সালে আলোচিত হয়েছিল। সেটি কী? কলকাতা বন্দর, কলকাতার বড়বাজার এলাকা এবং বিভিন্ন ইয়ার্ডে ডিজেল-চালিত যে সব গাড়ি ঢোকে, সেগুলিকেও নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। এই গাড়িগুলির বয়স ১৫ বছর পেরিয়েছে কি না, এদের পিইউসি সার্টিফিকেট আছে কি না, সেগুলিকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। কিন্তু এখন এসব পরীক্ষা করা হয় কি না আমাদের জানা নেই। পিইউসি সার্টিফিকেট প্রদানকারী কেন্দ্রগুলি যথাযথভাবে চলছে কি না তা দেখার দায়িত্ব দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের থাকলেও তারা সম্ভবত আর সেদিকে ফিরেও তাকায় না। এ সমস্ত ঘটনায় উত্তরোত্তর বায়ুদূষণ বৃদ্ধি পাবে। সরকারের মনোভাবও পরোক্ষে একেই সমর্থন করছে।

আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, কলকাতা তথা পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলি বায়ুদূষণে যথেষ্ট ভারাক্রান্ত। গত কয়েক বছরে কলকাতায় ক্ষতিকর দূষণকণা পিএম ২.৫ ক্রমশ বাড়ছে। এই দূষণকণা ফুসফুসে ক্যান্সার ঘটার আশঙ্কাও অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছে। এই বায়ুদূষণের সিংহভাগের জন্য দায়ী যানদূষণ ও নানারকম নির্মাণ কার্যসূচি। কলকাতার বুকে নানান আবাসন প্রকল্প হচ্ছে, মেট্রো রেল হচ্ছে, উড়ালপুল হচ্ছে। এসব নির্মাণ কাজ তো এক্ষুনি বন্ধ করা যাবে না; আর তা সম্ভবও নয়। কিন্তু যেটা বন্ধ করতে পারা যেত তা হল যানদূষণ। কিন্তু সেটাকে বন্ধ করা গেল না। কলকাতার মানুষের ফুসফুস ১৫ বা তার বেশি পুরানো বাণিজ্যিক গাড়ির কাছে বন্ধক রাখা হল। এমনিতেই কলকাতায় ব্যক্তিগত গাড়ির বয়স যাচাই করার কোন ব্যবস্থা এখনো নেই বলেই জানা যাচ্ছে। ফলে বিপদ কিন্তু ক্রমশ বাড়ছে। সম্প্রতি আমরা জেনেছি, বিমানচালনায় সহসা কোন বিপদ দেখা দিলে পাইলট ঘোষণা করেন 'মে ডে'। বায়ুদূষণে আচ্ছন্ন কলকাতার মানুষেরও আজ হয়তো বলার সময় এসেছে 'মে ডে'।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা ভি এস অচ্যুতানন্দন প্রয়াত

প্রসেনজিৎ দত্ত

ভেল্লিকাথু শঙ্করণ অচ্যুতানন্দন, যিনি পরিচিত ছিলেন ভি এস নামে। গত ২১ জুলাই ১০১ বছরে থেমে গেল তাঁর বর্ণময় ও কর্মময় জীবন। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির যে ৩২ জন জাতীয় পরিষদ সদস্য পার্টি থেকে বেরিয়ে এসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন , তাঁদের মধ্যে তিনিই ছিলেন শেষ জীবিত ব্যক্তি। ১৯২৩ সালের ২০ অক্টোবর জন্ম ভি এসের।দরিদ্র পরিবারের সন্তান ভি এস ছোটবেলাতেই হারান মা ও বাবাকে।মাত্র ১৭ বছর বয়সেই তিনি রাজনীতিতে প্রবেশ করেন।১৯৪০ সালেই লাভ করেন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ। সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করে শ্রমিক হিসাবে কাজ শুরু করেন। শৈশব থেকেই তিনি যে কষ্ট এবং বৈষম্যের শিকার হয়েছেন তাতেই তিনি নিজেকে কমিউনিস্ট আদর্শে গড়বার জন্য মনোনিবেশ করেন।প্রথমে তিনি শ্রমিক আন্দোলনে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেন অ্যাস্পিনওয়াল কোম্পানিতে।নারকেল ছোবড়া শিল্পের শ্রমিকদের সংগঠিত করেছিলেন সেখানে।সেই সময়তেই কুট্টানাডে ক্ষেতমজুরদের উপর চরম শোষণ চলছিল।ভি এস কে সেখানে যেতে নির্দেশ দেন কমিউনিস্ট নেতা পি কৃষ্ণ পিল্লাই। সেখানে গিয়ে তিনি ক্ষেতমজুরদের সংগঠিত করার কাজ শুরু করেন।

১৯৪৬ সালের ঐতিহাসিক পুন্নাপ্পা ভায়ালারের আন্দোলন। ত্রাভাঙ্করের দেওয়ানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সংগঠক ছিলেন ভি এস।তখন কিছুদিন আত্মগোপন করে থাকলেও অবশেষে গ্রেপ্তার হন তিনি।পুলিশি হেপাজতে চলে নির্মম অত্যাচার। ই এম এস নাম্বুদিরিপাদ, কৃষ্ণ পিল্লাই সহ অন্য নেতাদের খোঁজ চাইলেও ভি এস মুখ খোলেননি। তাঁর হাত বেঁধে লাঠি দিয়ে পায়ে আঘাত করা হয়,বেয়নেটও ব্যবহার করা হয়।যার ফলে প্রচুর রক্ত ক্ষরণ হয় ,জ্ঞান হারান তিনি। তাঁর অসার দেহ জঙ্গলে নিয়ে যাওয়া হয় পুড়িয়ে দেওয়া বা পুঁতে ফেলার উদ্দেশ্যে। সেই সময় অপর এক জেলবন্দী তাঁকে উদ্ধার করেন এবং হাসপাতালে ভর্তি করেন। চিকিৎসাতে তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেও আবার গ্রেপ্তার হন। জরুরি অবস্থার সময় তাঁকে ২১ মাস কারাবন্দী থাকতে হয়।

দীর্ঘদিন তিন কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ছিলেন।১৯৫৬ সালে ভি এস অবিভক্ত কমিউনিষ্ট পার্টির কেরালা রাজ্য কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। দুই বছর পর হন জাতীয় কাউন্সিল সদস্য। পরে পার্টি ভাগ হওয়ার সময় তিনি সেই ৩২ জনের মধ্যে ১ জন ছিলেন, যারা জাতীয় পরিষদ থেকে বেরিয়ে এসে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী) গঠন করেছিলেন। পার্টি তৈরির নেপথ্য কারিগরদের মধ্যে একমাত্র জীবিত নেতার মৃত্যুতে একটি অধ্যায় শেষ হলো।

ভি এস অচ্যুতানন্দন সি.পি. আই (এম) কেরালা রাজ্য কমিটির সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন ১৯৮০ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত। তিনি বেশ কয়েকবার বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। বিধানসভার বিরোধী দলনেতার দায়িত্ব পালন করেছেন দুই পর্যায়ে।২০০৬ সালে তিনি কেরালার মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। সেই সময় তাঁর বয়স ৮৩।

১৯৬৪ সালে সি.পি. আই (এম) ' র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৮৫ সালে পলিটব্যুরোর সদস্য। ২০১৬ সালে কেরালার এল ডি এফ সরকারের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস কমিশনের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পান তিনি। ২০১৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনের সময় রাজ্য জুড়ে প্রচারে অংশগ্রহণ করেছেন।

সি.পি. আই (এম) ' র বর্তমান সাধারণ সম্পাদক তার শোকবার্তায় লিখেছেন কমরেড ভি এস তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা বই থেকে নয় , বরং তাঁর নিজের জীবন এবং তাঁর চারপাশে দেখা শ্রমিক ও দরিদ্র মানুষের জীবন থেকে তৈরি করেছিলেন।

তাঁর শেষ যাত্রায় অসংখ্য মানুষের সমাগম হয়েছিল। সহজে মানুষের সঙ্গে মিশে যাওয়ার ক্ষমতাই তাঁকে জননেতা করে তুলেছিল। তাঁর বক্তৃতার অদ্ভুত আকর্ষণ, জনগণকে আরও কাছে টেনে আনতো। প্রশাসনে বিভিন্ন পদে থাকলেও তিনি আজীবন সহজ-সরলভাবে জীবন যাপন করেছেন। রাষ্ট্রের নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়েও তাঁর মাথা চিরকাল উঁচু থেকেছে। সংগ্রামী জীবনের জন্যই ভি এস কেরালার জনগণের কাছে অবিসংবাদিত নেতা হিসাবে চিরকাল থেকে যাবেন।

রতন থিয়াম

(১৯৪৮-২০২৫)

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'থিয়েটার অফ রুটস' বিপ্লবের অন্যতম বাহক রতন থিয়াম কেবল মণিপুর নয়, ভারতীয় নাট্য জগতে এক গুরুত্বপূর্ণ নাম। গত ২৩ জুলাই ৭৭ বছর বয়সে প্রয়াত হলেন ভারতীয় নাটকের কিংবদন্তী রতন থিয়াম। রতন থিয়াম ১৯৪৮ সালের ২০ জানুয়ারি মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলে জন্মগ্রহণ করেন।

রতন থিয়াম ছিলেন একজন দক্ষ নাট্যকার। মণিপুরের কোরাস রেপার্টরি থিয়েটার ছিল তাঁর নাট্যদল। উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রত্যন্ত ওই শহর থেকে তিনি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ নাটকগুলো মঞ্চস্থ এবং উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর থিয়েটারের অভিনেতারাও ছিলেন একাধারে নৃত্যশিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ, চিত্রশিল্পী। ১৯৭৬ সালে নিজের নাটকের দল কোরাস রেপার্টরি থিয়েটারের সূচনা করেন। রতন থিয়াম তাঁর নাটকগুলোতে মূলত মানুষের যন্ত্রণা তুলে ধরেছেন মণিপুরি দৃষ্টিকোণ থেকে এবং নিজের মতো করে।

রতনের বেশিরভাগ নাটকের বিষয় যুদ্ধ ও সংঘর্ষে ক্ষমতার বিনাশ। কয়েক বছর ধরেই তাঁর নির্দেশিত নাটকগুলোতে ভাসা ভাসা আশাবাদ দেখা যাচ্ছিল। এই আশাবাদ আবর্তিত হয়েছে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে একটি নতুন সমাজের সূচনা, পুনর্মিলন ও শান্তি প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে। প্রযোজনাগুলো উপস্তাপনার দিত থেকে ছিল খুবই দৃষ্টিনন্দন। শিল্পীদের তেজোদ্বিপ্ত অভিনয় সেখানে উপরি পাওনা। তিনি নাটকের পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছেন মহাকাব্য, পৌরাণিক কাহিনি ও লোককাহিনির আঙ্গিকে। মণিপুরের ঐতিহ্যবাহী সংগীত, নৃত্য, মার্শাল আর্ট এবং অন্যান্য আধুনিক ও সমসাময়িক নাট্য উপাদান ও যান্ত্রিক কলাকৌশলে সবই নাটকে সংযোজিত হয়েছে।

মহাভারতে কর্ণের মানসিক টানাপোড়েন নিয়ে লেখা নাটক 'কারানাভারাম', 'ইম্ফল ইম্ফল', চক্রব্যূহ, কালিদাস অবলম্বনে 'ঋতুসমহরম', রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' অনুসরণে 'দ্য কিং অফ ডার্ক চেম্বার',এর মতো প্রযোজনা করেছেন। ম্যাকবেথ তাঁর অন্যতম সেরা প্রযোজনা। মঞ্চস্থ হয়েছিল কলকাতাতেও।

তাঁর কবিতার বই 'নির্বাচিত কবিতা' অনুবাদ হয়ে প্রকাশিত হয়েছে বাংলায়। দুটি কাব্যসংগ্রহ 'তালাপামেল নাহাকসু' এবং 'সনাগী থম্বাল'-এ প্রকাশিত কবিতাগুলির মধ্য থেকে ২০৫টি কবিতা স্থান পেয়েছে ওই বইয়ে। নির্যাতন, সন্ত্রাস ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে রতন থিয়াম হচ্ছেন এক বলিষ্ঠ কণ্ঠ। পাশাপাশি রক্তে মিশে আছে মাটি।

প্রাদেশিক গণ্ডি ছাপিয়ে তিনি ভারতীয় নাটকে রেখেছেন তাৎপর্যপূর্ণ ছাপ। ১৯৮৯ সালে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন তিনি। সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি-তে সহ-সভাপতি পদে ছিলেন তিনি। তার পরে ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা'র চেয়ারপার্সন পদে নিযুক্ত ছিলেন তিনি। দীর্ঘ দিন ধরে বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন তিনি।

আজিজুল হক

বাসু আচার্য

সরকারি মতে ১৯৪৩ সালের ১ ফেব্রুয়ারি আজিজুল হকের জন্মতারিখ হলেও, আসল জন্মদিনটা ১৯৪২ সালের ২৮ আগস্ট। বর্ষামুখর শব-এ-বরাতের রাত। জন্মস্থান হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া মহকুমার রণমহল গ্রাম। তখন বাংলা জুড়ে মন্বন্তর। বাড়িতে বাড়িতে হাহাকার। কলকাতার রাজপথে ক্ষ্মফ্যান দাওক্ষ্ম আওয়াজ তুলে গৃহহারা ক্ষুধার্ত মানুষের মৃত্যু মিছিল। তবে এই দুর্ভিক্ষের আঁচ এসে পড়েনি আজিজুলের বাড়িতে। তাঁদের তো বিশাল জমিদারি। লোকে বলতো মীর সাহেবের জমিদারি। মুঘল বাদশাহ শাহজাহান-এর ইউনানী চিকিৎসক ছিলেন তাঁর পূর্বপুরুষেরা। কিংবদন্তি অনুযায়ী পয়গম্বরের বংশ, সৈয়দ, মাজহাব হানাফী সুন্নি। এক কথায় এলিট আশরাফী মুসলমান। আজিজুলের বাবার নাম সৈয়দ আধুল কাশেম, দোর্দণ্ডপ্রতাপ ধর্মপ্রাণ জমিদার। মা হাজারা বেগম। আজিজুলের পুরো গড়ে ওঠাটাই তাঁর মায়ের চিন্তা-ভাবনায়। বাপ-জেঠার চালানো জমিদারি নিপীড়নের বিপরীতে আজিজুলের মা ছিলেন একজন অসম্ভব সংবেদনশীল মহিলা। আকালের মাসগুলোতে তিনি লুকিয়ে গ্রামের লোকজনকে সাহায্য করতেন বাড়ির ধান-চাল-কলাই বিলিয়ে। ফাঁকা সময়ে তিনি আজিজুলকে পড়ে শুনাতেন শিরি-ফরাহাদের গল্প, পড়ে শুনাতেন লায়লা মজনু।

ছোটবেলাতেই আজিজুল তাঁর দাদাদের সঙ্গে পড়াশোনা করতে চলে আসেন কলকাতায়। সেখানেই, সুরেন্দ্রনাথ কলেজে আইএসসি পড়তে পড়তে, নন্দগোপাল ভট্টাচার্যের সঙ্গে পরিচয় হয় তাঁর। এভাবেই হয়ে যায় কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন। নন্দবাবু তাঁকে নিয়ে যান বিশ্বনাথ মুখার্জির কাছে। ১৯৫৯ সালে নন্দগোপাল ভট্টাচার্য, বিশ্বনাথ মুখার্জির প্রভাবে ছাত্র ফেডারেশনে যোগদান করেন আজিজুল। খাদ্য আন্দোলনের মিছিলে আহত হন। তারপর থেকে ধারাবাহিকভাবে আন্দোলনে থেকেছেন। ১৭ বছর বয়সে (এক বছর বয়স বাড়িয়ে) অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। ক্রমশ ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বে উঠে আসেন। ইতিমধ্যে কেমিস্ট্রি অনার্স নিয়ে পড়তে শুরু করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজে। তার আগে অবশ্য কিছুদিন পড়েছেন মেডিকেল কলেজে। ১৯৬৪ সালে পার্টি ভাগ হয়ে গেলে ছাত্র আন্দোলনের পাশাপাশি আজিজুল যোগদান করেন হাওড়া জেলা কৃষক সমিতিতে। মহকুমা কৃষক সমিতির সম্পাদক হন। নিজের বাবার বিরুদ্ধেই আন্দোলন করে কৃষকদের মধ্যে জমি বিলিয়ে দেন। সেই সময় থেকেই সশস্ত্র বিপ্লব বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয় তাঁর। কিন্তু একইসঙ্গে জ্যোতিবাবুর ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন, যদিও রাজনৈতিক ভাবে ছিলেন তাঁর প্রবল বিরোধী।

১৯৬৪ সালের শেষে জেল হয় তাঁর। ৬৫ সালে মুক্তি পান। শেষ যুক্ত কৃষক কনফারেন্সে 'লাঙল যার জমি তার' স্লোগানের বিরোধিতা করে লেনিনের 'ল্যান্ড টু দ্য টিলার্স' স্লোগানকে সামনে রেখে

আওয়াজ তোলেন ক্ষুযে চাষ করে, জমি তার।ক্ষু ৬৭ সালে নকশালবাড়ির ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর চারু মজুমদারের নেতৃত্ব স্বীকার করে সুন্দরবন এলাকায় সংগঠন করতে চলে যান। সেখানে গড়ে ওঠে ব্যাপক গেরিলা সংগঠন। দেশব্রতীতে সেই রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। লাটদার পালচৌধুরীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলেন আজিজুল ও তাঁর কমরেডরা। খতম করেন অত্যাচারী নায়েবকে। কিন্তু ১৯৭০ সালে ব্যাপক পুলিশী ধরপাকরের মধ্যে ধরা পড়ে যান। তাঁকে পেলে শুট টু কিলের অর্ডার ছিল। কিন্তু এক বড় অফিসারের মাধ্যমে আজিজুল ধরা পড়েছে জানতে পেরে ভূপেশ গুপ্ত ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে কথা বলে তাঁকে রক্ষা করেন। কিন্তু জেলে গিয়েও সংগ্রাম জারি রাখেন আজিজুল। ১৯৭২ সালে জেলের ভেতরে পুলিশের আঘাতে বিশ্রী ভাবে আক্রান্ত হন তিনি এবং অধ্যাপক নিশীথ ভট্টাচার্য। চূড়ান্ত অত্যাচার করা হয়। ইলেকট্রিক শক দেওয়া হয়, পা পুড়িয়ে দেওয়া হয় হিটারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ১৯৭৬ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি ওঁরা জেল ভাঙেন। নেতৃত্বে ছিলেন আজিজুল হক এবং নিশীথ ভট্টাচার্য। এই সংগ্রামে শহীদ হন কালু হালদার এবং স্বদেশ ঘোষ। বাইরে বেরিয়ে দুজনে তৈরি করেন চারু মজুমদারপন্থী সিপিআই (এম-এল) দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় কমিটি। দীর্ঘ পাঁচ, ছয় বছর ধরে দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় কমিটির গেরিলা লড়াই চলে পশ্চিমবাংলা ও বিহারের বিভিন্ন জেলায়।

১৯৮০-৮১ সালে তাঁদের দুজনের নেতৃত্বে বাংলা এবং বিহারের বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে গড়ে ওঠে স্বাধীন রাজত্বের এলাকা বা বিপ্লবী সরকার। এই নতুন বিপ্লবী সরকারের সভাপতি হিসেবে আসেন কানাইয়াজি ওঁরাও। রাষ্ট্র এবং সামরিক দায়িত্ব ভাগ করে নেন আজিজুল হক এবং প্রাক্তন বিডিও (নমিনেটেড আইএএস ক্যাডার) অনিলবরণ রায়। এই সময়ে কিছু দাবি আদায়ের প্রয়োজনে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা কাশীকান্ত মৈত্রকেও কিডন্যাপ করা হয় আজিজুলের নেতৃত্বে।এই পর্বেই তাঁর বিয়ে হয় মনিদীপা বক্সির সঙ্গে। কিন্তু পুলিশি ধরপাকড় বৃদ্ধি পেলে এবং কেন্দ্রীয় কমিটির এক সদস্যের বিশ্বাসঘাতকতায় ১৯৮২ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে সোদপুরের পার্শ্ববর্তী ঘোলার এক প্রেস থেকে পুলিশের জালে ধরা পড়েন আজিজুল। বামফ্রন্ট আমলে জেলে জান এবার। কিন্তু এবার তাঁর মুক্তির দাবিতে সরব হন সাধারণ জনগণ থেকে শুরু করে বাংলার বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা।

দীর্ঘ সাড়ে-সাত বছর পর ১৯৮৯ সালের ২৫ ডিসেম্বর মুক্তি পান আজিজুল। বেরিয়ে এসে প্রত্যক্ষ দলীয় রাজনীতিতে যোগদান না করলেও গণ-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন, শুরু হয় লেখালেখি। তাঁর বিখ্যাত বই 'কারাগারে ১৮ বছর' প্রকাশিত হয় ১৯৯০-৯১ সালে। তারপর থেকে একটানা লিখেছেন, থেকেছেন আন্দোলনের ময়দানে। মাওবাদী অভিযোগে রাজাবাজার সায়েন্স কলেজের অধ্যাপক কৌশিক গাঙ্গুলীর মুক্তির লড়াইয়ের পেছনের মূল মানুষটাই ছিলেন আজিজুল হক।

কিন্তু ২০০৭ সাল থেকে শুরু হয়ে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের পর্বে আজিজুল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সমর্থন জানান বামফ্রন্টকে। তিনি তৃণমূলী শক্তির বিরুদ্ধে বামফ্রন্টের প্রতি সমালোচনামূলক সমর্থন দেন এবং তার বিরোধী ও তৃণমূলের পক্ষাবলম্বনকারী শক্তিগুলোকে নির্মমভাবে সমালোচনা করেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, বামফ্রন্ট এতদিন সাম্রাজ্যবাদীদের কনসেশনে বেঁচে থাকলেও বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদীরা সামান্যতম বিরোধিতাও আর সহ্য করবে না, বামপন্থার গন্ধযুক্ত সমস্ত কিছুকেই সমূলে উৎপাটিত করবে। এই ক্ষেত্রে তৃণমূল কংগ্রেস এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাম্রাজ্যবাদীদের দামি বাজি। এই কথা বলে তিনি তীব্রভাবে তৃণমূল ও তার সহযোগী শক্তিগুলোর বিরোধিতা করতে থাকেন এবং সপ্তম বামফ্রন্ট সরকার ও তার মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের পাশে দাঁড়ান। এই নিয়ে ব্যাপক কুৎসা এবং আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয় তাঁকে। কিন্তু তারপরেও তিনি যা বিশ্বাস করেছেন তা স্পষ্ট ভাবে উচ্চারণ করেন। বাংলায় ক্ষমতা পরিবর্তন হয়ে যাবার পরেও বিভিন্ন প্রতিবাদে ও প্রচারে আজিজুল হক অংশগ্রহণ করেন। সুজেট জর্ডনের ঘর ধর্ষণের ঘটনায় তিনি গোটা রাজ্যজুড়ে ব্যাপক প্রচার করেন এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল কংগ্রেসের মুখোশ খুলে দেন। কিন্তু ক্রমশ শরীর ভেঙে যেতে আরম্ভ করে তাঁর। পারকিনসনস্-এর প্রকোপে তাঁর লেখালেখি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। ২০২৪ সালে ক্ষুপরিচয়ক্ষু পত্রিকার শারদ সংখ্যায় দীর্ঘদিন পর তাঁর একটি সাক্ষাৎকার ভিত্তিক আত্মজীবনীমূলক লেখা প্রকাশিত হয়। ক্রমাগত অসুস্থ হতে হতে অবশেষে তাঁর জীবনদীপ নিভে যায় গত ২১ জুলাই, ২০২৫ তারিখে।

সাংবাদিক সুমিত চক্রবর্তী প্রয়াত

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত জুলাই ২০২৫ রাত ১০.৪৫ মিনিটে মেইনস্ট্রিম পত্রিকার সম্পাদক এবং সপ্তাহ উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য সুমিত চক্রবর্তী দক্ষিণ কলকাতার একটি নার্সিং হোমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ । তাঁর পিতা নিখিল চক্রবর্তী ছিলেন অত্যন্ত খ্যাতিসম্পন্ন বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং ' মেইনস্ট্রিম ' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক জ্জ মা কমিউনিস্ট নেত্রী ও প্রাক্তন সাংসদ রেনু চক্রবর্তী। ১৯৯৮ সালে নিখিল চক্রবর্তীর মৃত্যুর পর সুমিত বাবু মেইনস্ট্রিম পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন জ্জ তাঁর স্ত্রী গার্গী চক্রবর্তী বিশিষ্ট লেখিকা ও সিপিআই দলের জাতীয় পরিষদের সদস্য ।

দ্রোহের দলিল ১

গোপা মুখার্জি

আর জি কর হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসকের নির্মম হত্যাকাণ্ড ও পাশবিক ধর্ষণের প্রতিক্রিয়ায় সূচনা হওয়া অভয়া আন্দোলন এযাবৎকালে বৃহত্তম গণ অভ্যুত্থান যেখানে কোন ঘোষিত রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছাড়াই দ্রোহের অগ্ন্যুৎপাত ঘটায়। ঘুম ভাঙ্গার গান নিমেষে বিদ্যুৎপ্রবাহ তৈরি করে শীত ঘুমে শুয়ে থাকা শিরদাঁড়ায়, ঋজু মেরুদণ্ড নিয়ে পালাবদলের স্বপ্নে সামিল হয় বাংলার মানুষ, গ্রাম শহর মাঠ পাথার বন্দরে ডাক ওঠে ,'জোট বাঁধো তৈরি হও । 'প্রথমে একজোট হন মেডিক্যাল কলেজগুলির প্রতিবাদী ছাত্র চিকিৎসকেরা। অচিরেই সাধারন মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ গণ আন্দোলনের জন্ম দেয়। মানুষ পথে নামেন, ন্যায় বিচারের দাবিতে। আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া বা ইংল্যান্ডের লিডসের আন্দোলনের অনুপ্রেরণায় বাংলায় বহমান আন্দোলনে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে 'Reclaim the Night– Reclaim the Right'। সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে মহানগরের গন্ডি ছাড়িয়ে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে, অন্যান্য রাজ্যে, এমন কি দেশের সীমানা ছড়িয়ে প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে।

রাজনৈতিক পরিসরের বিস্তৃতির সঙ্গে সাংস্কৃতিক নতুন রূপরেখা নির্মাণের কাজ শুরু হয় । ২ ফেব্রুয়ারি আনন্দবাজার রবিবাসরীয়তে 'কলকাতার আকাশে এক আগুনপাখি' নিবন্ধে অধ্যাপক অশোককুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন- 'প্রতিবাদের এত বৈচিত্র্য, এত বিভিন্ন প্রকরণ গত পঞ্চাশ বছরে চোখে পড়েনি।'

নতুন গান, নতুন শ্লোগান জন্ম নিচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। প্রতিদিন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে দ্রোহসাহিত্যের তালিকা। এক দ্রোহের অভিঘাতে জেগে উঠছে বিগত দ্রোহের চর্চা । রাজনৈতিক আর সামাজিক দ্রোহ থেকে জন্ম নিচ্ছে নতুন ইতিহাস আর সাহিত্য।

২০২৪ এর ডিসেম্বরে ওয়েস্ট বেঙ্গল ডক্টরস ফোরাম (WBDF) এর সম্পাদনায় ধর্মতলার অবস্থান মঞ্চে প্রকাশিত হয়েছে প্রবন্ধ ও কবিতা সঙ্কলন 'দ্রোহকাল ২০২৪'। ঐতিহাসিক ভাবে এই সঙ্কলনের গুরুত্ব অপরিসীম। 'দ্রোহকাল ২০২৪' অভয়া আন্দোলন সম্পর্কে প্রথম প্রকাশিত সঙ্কলন গ্রন্থ।

মুখবন্ধে সম্পাদকদ্বয়- জয়ন্ত দাস এবং সৌরভ তালুকদার লিখেছেন ' দেশ জুড়ে অভয়া -তিলোত্তমা এক প্রতীক হয়ে দাঁড়াল। আন্দোলনের প্রথম সারিতে এসে দাঁড়ালেন তরুণ চিকিৎসকেরা, নারী ও তৃতীয় লিঙ্গ অধিকার কর্মী রা এবং অবশ্যই বর্ষীয়ান চিকিৎসকেরা। পাশে রইলেন নাগরিক দের সমস্ত অংশ , এবং পতাকা নিয়ে বা না নিয়ে পশ্চিমবাংলার শাসক বিরোধী রাজনৈতিক দল গুলো। 'ডব্লিউবিডিএফ চায় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এই মহান আন্দোলনের প্রথম ১০০ দিনের ইতিহাস এখানে লিপিবদ্ধ থাকুক" ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার প্রয়াসে রচিত এই সংকলনে ইতিহাসের প্রামাণ্য দলিল হিসাবে আছে জয়েন্ট প্লাটফর্ম অফ ডক্টরস-এ র তরফে ১৫ অগাস্ট থেকে ১৬ অক্টোবর ২০২৪ এর মধ্যে প্রচারিত ১৩ টি অমূল্য প্রেস বিজ্ঞপ্তি। লেখকের তালিকায় আছেন ২৩ জন।

বিষাণ বসু 'অতিক্রান্ত দশ হপ্তা-দাবির দশ দফা' লেখায় জুনিয়র ডাক্তারদের দশ দফা দাবি নিয়ে আলোচনা করেছেন। শুভাংশু পাল 'প্রাতিষ্ঠানিক খুন' প্রবন্ধে গণ জাগরণের ব্যাপ্তিই এই আন্দোলনের সব চেয়ে বড় প্রাপ্তি। কৌশিক লাহিড়ীর দু'টি লেখা আছে এই সংকলনে। 'দ্রোহপক্ষের দুর্গা' য় আর জি করে শিল্পী অসিত সাহঁ এর তৈরি করা অভয়ার আবক্ষ মূর্তি সম্পর্কে লিখেছেন' এর আসল স্রষ্টা। হত্যাকারী সমাজ।..এ মুখ আমাদের নিশ্চিন্ত নিরাপদ নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটানো দুঃস্বপ্ন হয়ে জেগে থাকবে '। 'মহামায়া' রচনায় অভয়াকে দধীচির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। স্বতঃস্ফূর্ত গণ জাগরণে বজ্র হয়ে ফিরে এসেছে অভয়া, শাসকের বিনাশের জন্য-'অনেকে বলছেন মেয়েটি যেন দধীচির হাড়। আত্মাহুতি দিয়ে বজ্র দিয়ে গেল সমাজের হাতে '।

কৌশিক দত্ত- 'অভয়া ও লিঙ্গ রাজনৈতিক আন্দোলন' লেখায় অভয়া আন্দোলনের সূচনা, ১৪ অগাস্ট রাত দখলের ইতিহাস এবং পিতৃতান্ত্রিক সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। অরুণাচল দত্ত চৌধুরী 'আমরা যারা অরুণাচল' প্রবন্ধে ২০১৭ তে ডেঙ্গি প্রতিরোধে সরকারের ব্যর্থতা কে তুলে ধরার অপরাধে তাঁর সাসপেন্ড হওয়া এবং তাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করেছেন যে আন্দোলনের স্লোগান ছিল 'আমরা সবাই অরুণাচল'।

সদ্য প্রয়াত চিকিৎসক প্রলয় বসুর দু'টি লেখা আছে এই সঙ্কলনে , 'আন্দোলন আর খাপছাড়া লেখা', আর 'যাঁরা আন্দোলনে ছিলেন-নায়কদের গল্প'। দু'টি লেখাতেই এই আন্দোলনে সাধারণ নাগরিক দের অভূতপূর্ব অংশ গ্রহণ নিয়ে আলোচনা আছে. আন্দোলনকারী জুনিয়র চিকিৎসক রুমেলিকা কুমার ,'আন্দোলনের হৃদস্পন্দন বুকে নিয়ে' সূচনা থেকে অনশন মঞ্চ পর্যন্ত আন্দোলনের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তুলে ধরেছেন।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ লেখাগুলি হল অর্জুন দাশগুপ্তর 'অভয়া-তিলোত্তমা ও রাজনীতি-অরাজনীতি', শর্মিষ্ঠা দাসের 'তিলোত্তমা , নারীবাদী আন্দোলনে এক নতুন ঢেউ', অরুণিমা ঘোষের 'শারদীয়া উৎশব', বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শিক্ষা , আরোগ্য নিকেতন থেকে মৃত্যু শিবিরে অভিযাত্রা' সৌরভ তালুকদারের 'ওয়েস্ট বেঙ্গল ডক্টরস ফোরাম-একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয়' , চিন্ময় নাথের 'রাস্তায়', কাঞ্চন মুখার্জির 'নয়া ইতিহাস', চন্দ্রমৌলি ঝার 'হুমকি রাজের তিন বছর আর জি কর', জয়ন্ত ভট্টাচার্যের 'অভয়াকে ঘিরে জুনিয়র ডাক্তার আন্দোলন', নাগরিক সমাজ এবং Angana Bhttacharyya র 'And still we rise'

দীপঙ্কর ঘোষ এর লেখা একাঙ্ক নাটক অনন্তিকা এবং তীর্থঙ্কর ভট্টাচার্য, পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অরুণাচল দত্তচৌধুরীর কবিতা এই সঙ্কলনকে ঋদ্ধ করেছে। অসাধারণ কিছু আলোকচিত্র এই বই-এর অন্যতম সম্পদ।

নাগরিক স্মৃতিচারণা

বস্তুবাদী জ্যোতি বসু ছিলেন বাস্তববাদী জননেতা

মজিবুর রহমান

বাংলা তথা ভারতের সংসদীয় রাজনীতির ইতিহাসে জ্যোতি বসু (৮.৭.১৯১৪-১৭.১.২০১০) একটি বিশিষ্ট নাম। কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। প্রায় সাত দশকের দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে কখনও গুরুত্বহীন হয়ে পড়েননি। মৃত্যুর দেড় দশক পরেও তিনি আলোচিত ব্যক্তিত্ব। তাঁর নিজের দল তো বটেই বিরোধী দলের নেতারাও শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর নাম নেন। তাঁর মতো প্রখর প্রজ্ঞা ও প্রবল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন গুরুগম্ভীর রাজনৈতিক নেতা বাংলার রাজনীতিতে বিরল। মধ্যবিত্ত পরিবারের একজন শিক্ষিত সন্তান কিভাবে রাজনীতিকেই জীবনের ধ্যানজ্ঞান করলেন তা আমাদের জানা দরকার।

জ্যোতি বসুর বাবা-কাকা-জ্যাঠামশাইরা থাকতেন আসামের ধুবলিতে। তাঁর ঠাকুরদা ওখানে চাকরি করতেন। কিন্তু পৈত্রিক বাড়ি ছিল ঢাকা জেলার বারদিতে। মা হেমলতা দেবীর দিক থেকে দাদুর বাড়িও ছিল বারদি। পিতা নিশিকান্ত বসু ডিব্রুগড় মেডিক্যাল স্কুল থেকে ডাক্তারি পাস করে ঢাকায় কিছুদিন প্র্যাকটিস করেন। তারপর উচ্চশিক্ষার জন্য আমেরিকায় থাকেন ছ'বছর। দেশে ফিরে ডাক্তারি শুরু করেন। বেশ পসার হয়। জ্যোতি বসুর এক কাকা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াশোনা ও চাকরি করতে তেরো বছর আমেরিকায় ছিলেন। দুই জ্যাঠামশাই ওকালতি করতেন। এক জ্যাঠামশাই মুন্সেফ থেকে শুরু করে হাইকোর্টের জজ হন। যৌথ পরিবারের অভিভাবক ছিলেন নিশিকান্ত বসু।

জ্যোতি বসুর জন্ম ও বেড়ে ওঠা কলকাতায়। পড়াশোনা ইংরেজি মাধ্যমে। প্রথমে লরেটো কিন্ডারগার্টেন, তারপর সেন্ট জেভিয়ার্স। ১৯৩৫ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজিতে সাম্মানিক স্নাতক হন। ওই বছরের অক্টোবরে বিলেত যাত্রা করেন। আই সি এস পরীক্ষায় অকৃতকার্য হন। কিন্তু ব্যারিস্টারি পড়া চলতে থাকে আর ক্রমশ যুক্ত হতে থাকেন রাজনৈতিক কার্যকলাপে। ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দের সংস্পর্শে আসেন। বেন ব্র্যাডলে, হ্যারি পলিট, রজনীপাম দত্ত, ক্লিমেন্স দত্ত প্রমুখের সঙ্গে আলাপ হয়। শুরু হয় ভূপেশ গুপ্ত, স্নেহাংশু আচার্য, ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, নিখিল চক্রবর্তী, বীরেশ গুহ, ভি কে কৃষ্ণ মেনন প্রমুখ প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের সঙ্গে স্বদেশের স্বাধীনতার সপক্ষে জনমত গড়ে তোলার প্রয়াস। লন্ডন, কেমব্রিজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় পড়ুয়াদের নিয়ে গঠিত হয় লন্ডন মজলিস। সম্পাদক নির্বাচিত হন জ্যোতি বসু। লন্ডন মজলিসের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় জওহরলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র বসু, বিজয় লক্ষ্মী পণ্ডিত, ইউসুফ মেহের আলি, ভুলাভাই দেশাই প্রমুখ স্বাধীনতা আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দকে। ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বরে ব্যারিস্টারি পরীক্ষার শেষ অংশ সমাপ্ত হয়। ১৯৪০ সালের জানুয়ারিতে দেশে ফিরে আসেন। ব্যারিস্টার হিসেবে কলকাতা হাইকোর্টে নাম লেখান কিন্তু রাজনীতি করবেন বলে কখনও প্র্যাকটিস করেননি। তাঁর বাবা অবশ্য চেয়েছিলেন তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মতো রাজনীতির পাশাপাশি ব্যারিস্টারিটাও করুন। '৪০-এর জানুয়ারি মাসে তাঁর বিয়ে হয় কিন্তু বিয়ের অল্পদিন বাদেই তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়।

সমাজতন্ত্রে দীক্ষিত জ্যোতি বসু দেশে ফিরেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন এবং সর্বক্ষণের কর্মী হন। সেই সময় ১৯৩৪ সাল থেকে সি পি আই বেআইনি ছিল। তবে পার্টির নির্দেশ অনুযায়ী তিনি আন্ডারগ্রাউন্ডে যাননি। তাঁদের হিন্দুস্তান রোডের বাড়িতে পার্টির গোপন বৈঠক হতো এবং আত্মগোপনকারী নেতাদের আশ্রয় দেওয়া হতো। তিনি পার্টির জন্য চাঁদা সংগ্রহ করতেন এবং পার্টি ক্লাস নিতেন।

১৯৪১ সালের ২২শে জুন নাৎসি জার্মানি সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করে। সি পি আই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে জনযুদ্ধ হিসেবে চিহ্নিত করে। ২১শে জুলাই কলকাতায় গঠিত হয় 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি'। জ্যোতি বসু সম্পাদক নির্বাচিত হন। জ্যোতিবাবুরা ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের বিরোধিতা করেন কারণ তাঁরা মনে করেছিলেন প্রস্তাবিত আন্দোলন ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে দুর্বল করবে।

১৯৪৪ সালে কিছুদিন বন্দর ও ডক শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করার পর রেলওয়ে শ্রমিকদের সংগঠিত করার দায়িত্ব পালন করেন জ্যোতি বসু। গড়ে ওঠে বি এন রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন। জ্যোতি বসু হন সাধারণ সম্পাদক। ১৯৪৫ সালে তিনি সি পি আই-এর বঙ্গীয় প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৬ সালে রেলওয়ে কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী হুমায়ূন কবীরকে (১৯০৬-১৯৬৯) পরাস্ত করে বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। দার্জিলিং ও দিনাজপুর কেন্দ্র থেকে জয়লাভ করেন যথাক্রমে রতনলাল ব্রাহ্মণ ও রূপনারায়ণ রায়। জ্যোতি বসু সি পি আই গ্রুপের নেতা হন। বন্দী মুক্তি, খাদ্য সংকট, আগস্টের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, তেভাগা আন্দোলন প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আইনসভার ভেতরে ও বাইরে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

সি পি আই ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগ ও বঙ্গবিভাজনের বিরোধিতা করে। কিন্তু পরিস্থিতির বাধ্যবাধকতায় দুটোই মেনে নিতে হয়। পার্টির অবস্থান অনুযায়ী আইনসভার সদস্য হিসেবে জ্যোতি বসু তাঁর দায়িত্ব পালন করেন। প্রত্যাশিতভাবেই তিনি সি পি আই-এর পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন।১৯৪৮ সালের ২৫শে মার্চ পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি ঘোষিত হয়। পরদিনই খুব

সকালে তিনি গ্রেপ্তার হন এবং জুন মাসে জেল থেকে মুক্তি পান। ডিসেম্বর মাসে কমল বসুর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পুণরায় গ্রেপ্তার হন। হাইকোর্টের নির্দেশে ১৯৫১ সালের ৫ই জানুয়ারি সি পি আই-এর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা ওঠে। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে ১৩ই জানুয়ারি মনুমেন্ট ময়দানে জনসভায় সভাপতিত্ব করেন। ৯ই ফেব্রুয়ারি নব পর্যায়ে প্রকাশিত দৈনিক 'স্বাধীনতা' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৫২ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে বরানগর বিধানসভা কেন্দ্রে সি পি আই-এর প্রার্থী হিসেবে জ্যোতি বসু ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মন্ত্রিসভার সদস্য কংগ্রেস প্রার্থী হরেন্দ্রনাথ চৌধুরীকে পরাস্ত করেন। বিধানসভার মোট ২৩৮টি আসনের মধ্যে ৭১টিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সি পি আই জেতে ২৮টি। জ্যোতি বসু সি পি আই বিধায়কদের নেতা নির্বাচিত হন এবং 'প্রধান বিরোধী দলের নেতা' হিসেবে স্বীকৃতি পান।

১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বরে তাঁর একমাত্র সন্তান চন্দন বসুর জন্ম হয়। ১৯৫৩-এর ডিসেম্বর থেকে '৬১-এর জানুয়ারি পর্যন্ত তিনি পার্টির পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক পদে আসীন থাকেন। '৫৪ সালের জানুয়ারিতে ৩৯ জন সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হন। '৫৩-এর ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন, '৫৪-এর শিক্ষক আন্দোলন এবং '৫৬-এর বাংলা-বিহার সংযুক্তির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

১৯৫৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ২৫২টি আসনের মধ্যে ১০৩টিতে প্রার্থী দিয়ে সি পি আই ৪৬টিতে জয়ী হয়। জ্যোতি বসু বরানগরে কংগ্রেস প্রার্থী কানাইলাল ঢোলকে পরাজিত করেন এবং সি পি আই-এর পরিষদীয় দলের নেতা হিসেবে বিধানসভায় বিরোধী দলনেতার স্বীকৃতি পান। '৫৯ সালে বামপন্থী দল ও সংগঠনগুলোর নেতৃত্বে সংগঠিত খাদ্য আন্দোলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং গ্রেপ্তার হন। ৩১শে আগস্ট পুলিশের গুলি চালনা ও লাঠিচার্জের ফলশ্রুতিতে ৮০ জন আন্দোলনকারী নিহত হন। সেই থেকে প্রতি বছর ৩১শে আগস্ট শহীদ দিবস পালন করা হয়।

১৯৬২ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ২৫২টি আসনের মধ্যে ১৪৫টিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সি পি আই ৫২টিতে জয়লাভ করে। বরানগর কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী ধীরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জিকে পরাজিত করে জ্যোতি বসু পুনর্নির্বাচিত হন। পুনরায় বিরোধী দলনেতাও হন। '৬২ সালে চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের প্রেক্ষাপটে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে ভারত রক্ষা আইনে নভেম্বর মাসে তাঁকে কারাবন্দী করা হয় এবং পরের বছর ডিসেম্বর মাসে মুক্তি পান। তিনি জেলে থাকাকালীন অবস্থায় তাঁর বাবার মৃত্যু হয় এবং এক দিনের জন্য প্যারোলে ছাড়া পেয়ে বাবার শেষকৃত্যের অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

১৯৬৪ সালের ১৪ই এপ্রিল ডাঙ্গেগোষ্ঠীর সঙ্গে মতবিরোধের কারণে জ্যোতি বসু সহ ৩২ জন সদস্য সি পি আই-এর জাতীয় পরিষদের বৈঠক ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। তাঁদের আহ্বানে ৭-১১ জুলাই অন্ধ্রপ্রদেশের তেনালিতে অনুষ্ঠিত কনভেনশনে ১৪৬ জন প্রতিনিধি মিলিত হন। ৩১ অক্টোবর- ৭ নভেম্বর কলকাতার ত্যাগরাজ হলে আয়োজিত সপ্তম কংগ্রেসে যোগদান করেন ৪২২ জন প্রতিনিধি। কংগ্রেসে স্বাগত ভাষণ দেন জ্যোতি বসু। ৯ সদস্য বিশিষ্ট পলিটব্যুরোর অন্যতম সদস্য হন তিনি। দলের নামকরণ হয় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)। ১৯৬৫ সালের জুন মাসে জ্যোতি বসুর সম্পাদনায় সি পি আই (এম)-এর কেন্দ্রীয় মুখপত্র 'পিপলস্ ডেমোক্র্যাসি' প্রকাশিত হয়। জুলাই মাসে কারারুদ্ধ হন এবং '৬৬-এর মার্চে মুক্তি পান। ডিসেম্বরে সাতটি পার্টি নিয়ে 'সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্ট' (ইউ এল এফ) গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

১৯৬৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ২৮০টি আসনের মধ্যে জাতীয় কংগ্রেস জেতে ১২৭টিতে। ইউ এল এফ জেতে ৬৮টিতে।এর মধ্যে সি পি আই (এম) পায় ৪৩টি। অন্যদিকে পি ইউ এল এফ জেতে ৬৫টিতে। এরমধ্যে বাংলা কংগ্রেস এবং সি পি আই পায় যথাক্রমে ৩৪টি ও ১৬টি আসন। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে জাতীয় কংগ্রেসের পরেই দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে সি পি আই (এম)। তবু বৃহত্তর রাজনৈতিক স্বার্থে ২রা মার্চ গঠিত যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন বাংলা কংগ্রেসের নেতা অজয় মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৮৬)। অর্থ ও পরিবহন দপ্তর সহ উপমুখ্যমন্ত্রী হন জ্যোতি বসু। রাজ্যপাল ধরমবীর ২১শে নভেম্বর এই সরকারকে বরখাস্ত করেন। জাতীয় কংগ্রেসের সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করেন ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। তাঁর পি ডি এফ সরকার '৬৮-এর ২০শে ফেব্রুয়ারি পদত্যাগ করে।

১৯৬৯-এর ৯ই ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত মধ্যবর্তী নির্বাচনে ২৮০টি আসনের মধ্যে জাতীয় কংগ্রেস ও যুক্তফ্রন্ট পায় যথাক্রমে ৫৫ ও ২১৪টি আসন। যুক্তফ্রন্টের শরিক দল হিসেবে সি পি আই (এম), বাংলা কংগ্রেস এবং সি পি আই জেতে যথাক্রমে ৮৩, ৩৩ ও ৩০টি আসনে। অর্থাৎ সি পি আই (এম) পশ্চিমবঙ্গে একক বৃহত্তম দলে পরিণত হয়। কিন্তু যুক্তফ্রন্টের ঐক্যের স্বার্থে অজয় মুখার্জিকেই মুখ্যমন্ত্রী করে ২৫শে ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করা হয়। সাধারণ প্রশাসন, স্বরাষ্ট্র দফতর সহ উপমুখ্যমন্ত্রী হন জ্যোতি বসু। কিন্তু কিছু প্রশাসনিক বিষয় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উপমুখ্যমন্ত্রীর সংঘাতে সরকারের অস্তিত্ব নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হয়। মুখ্যমন্ত্রী নিজের সরকারকেই 'বর্বর সরকার' বলে অভিহিত করেন এবং 'আইন-শৃঙ্খলা বিপন্ন' হবার অভিযোগে ১লা ডিসেম্বর কার্জন পার্কে তাঁবু খাটিয়ে অনশন শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত ১৯৭০-এর ১৬ই মার্চ মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করেন এবং এর ফলে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটে।

১৯৭১ সালের ১০ই মার্চ অনুষ্ঠিত বিধানসভা নির্বাচনে ২৮০টি আসনের মধ্যে সি পি আই (এম), জাতীয় কংগ্রেস, সি পি আই, বাংলা কংগ্রেস জেতে যথাক্রমে ১১৩, ১০৫, ১৩, ৫টি আসন। বরানগর কেন্দ্রে দ্বিমুখী লড়াইয়ে সি পি আই (এম) প্রার্থী জ্যোতি বসু বাংলা কংগ্রেসের প্রার্থী অজয় মুখার্জিকে ১১০৫৩ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন। তৎসত্ত্বেও জ্যোতি বসুকে সরকার গড়তে ডাকা হয়নি। অজয় মুখার্জি জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সমর্থন নিয়ে ২রা এপ্রিল সরকার গঠন করেন যার অবসান ঘটে ২৫শে জুন। '৭২-এর ১১ই মার্চ মধ্যবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ব্যাপক রিগিংয়ের প্রতিবাদে ভোটের দিন জ্যোতি বসু নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা ঘোষণা করেন। ২৯৪টি আসনের মধ্যে জাতীয় কংগ্রেস জেতে ২১৬টিতে। মুখ্যমন্ত্রী হন সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়। সি পি আই (এম)-এর ১৪ জন বিধায়ক বিধানসভা বয়কট করেন।

১৯৭৫ সালের ২৫শে জুন দেশজুড়ে জরুরি অবস্থা জারি করার মধ্য দিয়ে ইন্দিরা গান্ধীর স্বৈরশাসনের সূচনা হয়। '৭৭-এর ১৮ই জানুয়ারি লোকসভা ভোটের ঘোষণা করা হয় যা অনুষ্ঠিত হয় ১৬ই মার্চ। ইন্দিরা গান্ধী রায়বেরেলি কেন্দ্রে পরাজিত হন এবং কংগ্রেসের ভরাডুবি হয়। মোরারজি দেশাইয়ের নেতৃত্বে কেন্দ্রে প্রথম বারের মতো অকংগ্রেসী সরকার গঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে ৪২টির মধ্যে সি পি আই (এম) জেতে ১৭টি আর কংগ্রেস পায় ৩টি। সি পি আই একটিও জিততে পারেনি। জুন মাসে অনুষ্ঠিত বিধানসভা নির্বাচনে ২৯৪টি আসনের মধ্যে ছ'টি শরিক দলের বামপন্থী ফ্রন্ট ২৩০টি আসনে জয়লাভ করে। সি পি আই (এম) একাই পায় ১৭৮টি। জ্যোতি বসু সাতগাছিয়া বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জয়লাভ করেন। কংগ্রেস এবং সি পি আই-এর দখলে যায় যথাক্রমে ২০টি ও ২টি আসন। ২১শে জুন বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন জ্যোতি বসু। সাধারণ মানুষের হাতে ক্ষমতাকে পৌঁছে দেওয়ার ভাবনা থেকে তিনি বলেন, 'আমরা শুধু রাইটার্স বিল্ডিং থেকে সরকার চালাবো না। ' এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ১৯৭৮ সালের জুন মাসে অনুষ্ঠিত হয় ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন। এরপর ধাপে ধাপে পৌরসভাগুলোর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পঞ্চায়েত ও পৌরসভাগুলো স্থানীয় সরকার হিসেবে কাজ করে। পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থা জাতীয় স্তরে প্রশংসিত হয়।

১৯৭৭ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত উপর্যপুরি পাঁচ বার জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। টানা তেইশ বছর তিনি মুখ্যমন্ত্রী থাকেন। ২০০০ সালের ৬ই নভেম্বর ৮৬ বছর বয়সে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে অব্যাহতি নেন। তবে তিনি জানান, মুখ্যমন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিলেও রাজনীতি ছাড়বেন না। ২০০১ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি শেষ বারের মতো বিধানসভা যান। বিধায়কদের ভূয়সী প্রশংসার জবাবে বলেন, 'প্রশংসা বিষবৎ, নিন্দা অমৃতসমান'।

২০০২ সালের মে মাসে 'ভারতীয় গণতন্ত্র ও বামপন্থীদের অভিজ্ঞতা' বিষয়ে দিল্লিতে জি ভি মভলংকর (লোকসভার প্রথম স্পিকার) স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন। জুলাই মাসে লন্ডনে ব্রিটিশ লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষের একটি অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত হন।

২০০৩ সালের নভেম্বরে শ্রমিক সংগঠনের একটি অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'মিছিলের অধিকার, ধর্মঘটের অধিকার আপনারা কিছুতেই ছাড়বেন না। এসব বন্ধ হলে দেশ স্বৈরতন্ত্রের পথে যাবে।' ২০০৪ সালে চতুর্দশ লোকসভা নির্বাচনের সময় দেশে ধর্মনিরপেক্ষ সরকার গড়তে ও লোকসভায় বামপন্থীদের শক্তি বাড়াতে তিনি নির্বাচনী প্রচারে নেতৃত্ব দেন।

২০০৫ সালের জানুয়ারিতে রাজস্থানের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জ্যোতি বসুকে বিশেষ সম্মান প্রদান করে। এপ্রিল মাসে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত সি পি আই (এম)-এর অষ্টাদশ পার্টি সম্মেলনে যোগ দেন। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক 'ভারতরত্ন' সম্মাননা গ্রহণের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। ২০০৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময় বলেন,'মৃত্যুর আগে সপ্তম বামফ্রন্ট সরকার দেখে যেতে চাই।' বলা বাহুল্য তাঁর সেই ইচ্ছা পূরণ হয়েছিল।

২০০৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জ্যোতি বসুকে 'ডক্টর অফ ল' সম্মান প্রদান করে। ২০০৮ সালে কোয়েম্বাটোরে অনুষ্ঠিত ১৯তম পার্টি কংগ্রেসে তিনি শারীরিক কারণে যোগ দিতে না পারলেও তাঁকে পলিটব্যুরোর স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য করা হয়। ৭ই ডিসেম্বর ফিদেল কাস্ত্রোর ভক্ত প্রখ্যাত ফুটবলার মারাদোনা কলকাতা সফরকালে জ্যোতি বসুর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন।

২০১০ সালের প্রথম দিনেই নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে জ্যোতি বসু আমরি হাসপাতালে ভর্তি হন। সেখানেই ১৭ই জানুয়ারি তাঁর জীবনাবসান ঘটে। সুশ্রুত আই ফাউন্ডেশনে তাঁর চক্ষুদান করা হয়। তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে কলকাতাতে হাজির হন দেশ বিদেশের বহু রাজনৈতিক নেতা সহ বিভিন্ন পেশার স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গ এবং অগণিত সাধারণ মানুষ। রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শোক পালনের পর ১৯শে জানুয়ারি চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণার জন্য এস এস কে এম হাসপাতালে তাঁর দেহদান করা হয়।

মুখ্যমন্ত্রী ও একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে জ্যোতি বসু তাঁর দীর্ঘ জীবনে নিশ্চিতভাবেই অনেক উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। রাজ্যের উন্নয়ন তথা রাজ্যবাসীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে অনেক অবদান রেখেছেন। রাজ্যকে গড়ে তোলার আন্তরিক চেষ্টা করেছেন।

১৯৭৭ সালে সরকার গঠনের পর মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তিনি রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের রাজনৈতিক ভাবেই মোকাবেলা করার পক্ষপাতী ছিলেন। প্রশাসন বা বিচার বিভাগের সাহায্যে গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করতে চাননি।

ভূমি সংস্কার কর্মসূচির মাধ্যমে জোতদারদের বেআইনি জমি অধিগ্রহণ করে তা ভূমিহীনদের মাঝে বন্টন করা তাঁর সরকারের একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য। 'লাঙল যার জমি তার'- এই বামপন্থী স্লোগানের বাস্তবায়ন গরিব মানুষদের জন্য খুব উপযোগী ছিল।

শিক্ষার প্রসারে জ্যোতি বসুর সরকার ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক হওয়ার ফলে নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তানদের শিক্ষাঙ্গনে যাতায়াত বৃদ্ধি পায়। চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। সাক্ষরতার হার সহ স্নাতক-স্নাতকোত্তর তরুণ-তরুণীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ইংরেজি তুলে দেওয়ার দলীয় সিদ্ধান্তে ব্যক্তিগত ভাবে জ্যোতি বসুর সমর্থন ছিল না বলে জানা যায়।

সরকার বিভিন্ন দপ্তরে উপযুক্ত সংখ্যায় কর্মী নিয়োগের মাধ্যমে বেকার সমস্যা সুরাহার চেষ্টা করে। তবে সরকারি কর্মচারীদের কর্মসংস্কৃতি নিয়ে জ্যোতিবাবু সন্তুষ্ট ছিলেন না। 'লাল ফিতের ফাঁস' ছিল বিরক্তিকর বিলম্বের অপর নাম। তাই বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মুখ্যমন্ত্রী হয়ে বলেন, ডুইট নাও। যদিও এই মন্ত্রে কাজ হয়েছিল বলে মনে হয় না।

শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত করার লক্ষ্যে সার্ভিস কমিশন গঠন জ্যোতি বসু সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান। শিক্ষক সমাজের প্রতি জ্যোতি বসুর একটা বাড়তি ভালোবাসা ছিল বলে মনে হয়। শিক্ষকদের জন্য সম্মানজনক বেতনকাঠামো তাঁর আমলেই প্রবর্তন করা হয়। আর্থিক দৈন্যদশা থেকে শিক্ষক সমাজের মুক্তি মেলে। শিক্ষকতা আর্থিক ভাবে আকর্ষণীয় বৃত্তি হয়ে ওঠে।

শহরে লোডশেডিং নিয়ে সমালোচনা থাকলেও গ্রামে বৈদ্যুতিকীকরণের কাজে অগ্রগতি ঘটে। বিদ্যুৎ ঘাটতি মেটাতে একাধিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। গ্রামের রাস্তা কাঁচা থেকে লাল মাটি হয়ে পাকা হতে শুরু করে।

জ্যোতি বসুর সরকার কৃষি ক্ষেত্রে জোর দেয়। উদ্বৃত্ত ফসল ফলানো সম্ভব হয়। বিভিন্ন শস্য উৎপাদনে এরাজ্য জাতীয় স্তরে প্রথম, দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় স্থান দখল করে। জ্যোতি বসুর আমলে কেন্দ্রীয় সরকারের অসহযোগিতা সহ নানান কারণে রাজ্যে ভারী শিল্প স্থাপনের কার্যকরী উদ্যোগ দেখা যায়নি। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তাই মুখ্যমন্ত্রী হয়ে বলেছিলেন, 'কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ।' কিন্তু রাজনৈতিক বিরোধীদের আক্রমণাত্মক বিরোধিতার কারণে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে শিল্প করা সম্ভব হয়নি।

রাজারহাট-নিউটাউন উপনগরী গড়ে তোলা জ্যোতি বসু সরকারের একটি বড় কৃতিত্ব।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার্থে জ্যোতি বসুর ভূমিকা ছিল অনবদ্য। ইন্দিরা গান্ধীর হত্যাকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে শিখদের ওপর আক্রমণ অথবা বাবরি মসজিদ ধ্বংসের প্রেক্ষাপটে পশ্চিমবঙ্গে কোনো দাঙ্গা হতে পারেনি জ্যোতি বসুর অত্যন্ত দৃঢ় ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাবের কারণেই। তিনি মনে করতেন, সরকার না চাইলে দাঙ্গা হয় না।

১৯৭৯ সালের জানুয়ারিতে মরিচ ঝাঁপির ঘটনা, ১৯৮৮ সালের জুন মাসে কাটরা মসজিদের ঘটনা অথবা ১৯৯৩ সালের ২১শে জুলাইয়ের ঘটনা পার্টি কিংবা প্রশাসনের উপর কোনো নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারেনি। এটা সম্ভব হয়েছিল জ্যোতি বসুর যেকোনো বিরুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার অসাধারণ ক্ষমতা ও দক্ষতার কারণে।

বেঙ্গল ল্যাম্প বিতর্কে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর কোনো দোষ ছিল না বলেই প্রমাণিত হয়েছে। ওই বিতর্ক সৃষ্টি করার কারণে পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং তাঁর দল আর এস পি থেকেও বহিষ্কৃত হন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জ্যোতি বসু সাধারণত তাঁর ছেলে চন্দন বসুর পরিবারের সঙ্গে থাকতেন না। জ্যোতি বসুর শেষ জীবনের চিকিৎসার খরচও পার্টি বহন করে।

দলীয় নেতা হিসেবে জ্যোতি বসু ছিলেন পুরোপুরি 'পার্টি ম্যান'। দলের শৃঙ্খলা ও সিদ্ধান্তকে সবসময় শিরোধার্য করতেন। নিজেকে কখনও 'দলের চেয়ে বড়' ভাবতেন না। সরকার পরিচালনার সময় প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দলের সঙ্গে আলোচনা করেই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করতেন। '৯৬ সালে দলের সংখ্যাগরিষ্ঠের মতকে মর্যাদা দিয়েই তিনি প্রধানমন্ত্রিত্বের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন যদিও তিনি ব্যক্তিগত ভাবে মনে করতেন দলের সিদ্ধান্তটি ছিল 'ঐতিহাসিক ভুল'।

বস্তুবাদী জ্যোতি বসু অত্যন্ত বাস্তববাদী ছিলেন। বাস্তবতার সাথে মানানসই নয় এমন কাজ বা পদক্ষেপ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতেন। এজন্য তাঁকে খুব বেশি তত্ত্বকথার আশ্রয় নিতে দেখা যেত না। তাঁর প্রখর দূরদর্শিতা ছিল। কোনো ঘটনাপ্রবাহ কোন দিকে যেতে চলেছে তা নির্ভুলভাবে বুঝতে পারতেন। পরিস্থিতির মূল্যায়নে তাঁকে সচরাচর ভুল করতে দেখা যায়নি।

জ্যোতি বসু ছিলেন একজন মিতবাক ব্যক্তি। অপ্রয়োজনীয় অথবা অবান্তর কথা বলা একদমই পছন্দ করতেন না। খুব কম কথায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে দেখা যেত তাঁকে।জনসভায় সাধারণ মানুষের বোধগম্য ভাষায় কথা বলতেন। তাঁকে কখনও কোনো বক্তব্য ফিরিয়ে নিতে, আলটপকা কিছু বলে ফেলার জন্য দুঃখপ্রকাশ করতে অথবা ভুল স্বীকার করতে দেখা যায়নি।

মুখ্যমন্ত্রী তথা বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে জ্যোতি বসু বহু বিদেশ সফর করেন। তাঁর একটা আন্তর্জাতিক পরিচিতি ও খ্যাতি গড়ে উঠেছিল। এজন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আমন্ত্রিত হতেন। রাষ্ট্রনেতাদের সাথে তাঁর সাক্ষাৎকার হত। তাঁর সফরের তালিকায় রয়েছে চীন, কিউবা, মস্কো, ভিয়েতনাম, গণতান্ত্রিক কোরিয়া, ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জার্মানি, দক্ষিণ আফ্রিকা, যুগোস্লাভিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, রোমানিয়া, পোল্যান্ড, প্যারিস, জেনিভা, হাঙ্গেরি ও বাংলাদেশ। জ্যোতি বসুও সরকার বা দলের পক্ষ থেকে হো-চি মিন, ফিদেল কাস্ত্রো, ক্রুশ্চেভ, বুলগানিন, চৌ-এন-লাই, ইয়াসের আরাফাত, নেলসন ম্যান্ডেলা প্রমুখ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে কলকাতায় স্বাগত জানিয়েছেন অথবা সংবর্ধনা দিয়েছেন।

জ্যোতি বসু মনে করতেন, কেউ কাউকে মনে রাখে না। তাঁর সম্পর্কে কে কী বলল সেসব নিয়ে তিনি মাথা ঘামাতেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন, মানুষই ইতিহাস তৈরি করে। পার্টির নেতাকর্মীদের বারবার মানুষের কাছে যাওয়ার কথা বলতেন। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের তৈরি রাজনৈতিক ইতিহাসে জ্যোতি বসুর নামটা নিশ্চিতভাবেই উপরের দিকে থাকবে। কমরেডরা বলবেন, জ্যোতি বসু অমর রহে।

ঋণ স্বীকার :
(১) যত দূর মনে পড়ে/জ্যোতি বসু ।
(২) জ্যোতি বসু রচনা ও আলোচনা/জ্যোতি বসু জন্মশতবর্ষ উদযাপন কমিটি ।
(৩) কিংবদন্তী জননেতা জ্যোতি বসুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি/পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ কর্মচারী সমিতি
(৪) সমসাময়িক রাজনীতিতে জ্যোতি বসু/প্রমথেশ মুখার্জী।
(লেখক মুর্শিদাবাদ কাবিলপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। মতামত লেখকের নিজস্ব)।

জরুরি অবস্থার প্রেক্ষাপট ও সাম্প্রদায়িক দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার শক্তির অবস্থান

সুশান্ত দাসগুপ্ত

৩

পুলিশ মিলিটারিকে বিদ্রোহের ডাক- জে.পি'র বক্তৃতা

২৫ জুন 'জন মোর্চার' নামে ও ডাকে দিল্লিতে এক বিশাল জমায়েত হয়। বিরোধী নেতৃবৃন্দ এই সমাবেশে বলেন, ইন্দিরা গান্ধি ক্ষমতায় থাকার নৈতিক অধিকার হারিয়েছেন। তাঁকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আর কাজ করতে দেওয়া হবে না। তাঁকে দপ্তর থেকে উৎখাত ও পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হবে। এর জন্য এক সপ্তাহ ধরে সারা দেশব্যাপী প্রচার, জমায়েত, বিক্ষোভ, আইন অমান্য ইত্যাদির মাধ্যমে অচলাবস্থা সৃষ্টি করা হবে। এই অভিযান পরিচালিত হবে নবগঠিত 'লোক সংঘর্ষ সমিতি'র নেতৃত্বে। এর সভাপতি হন মোরারজি দেশাই এবং সাধারণ সম্পাদক করা হয় নানাজি দেশমুখকে। শ্রীদেশমুখ আর এস এস-এর একজন প্রচারক ছিলেন। ঘোষণা করা হয় ২৯ জুন থেকে সারা দেশের ৩৫৬টি জেলা সদর ও প্রাদেশিক রাজধানীগুলিতে এই কর্মসূচি শুরু হবে। রাজধানীতে প্রতিদিন স্বেচ্ছাসেবকরা গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাও করবে। এক সপ্তাহ পর এক লক্ষ লোক নিয়ে ইন্দিরা গান্ধির বাড়ির চারদিক থেকে ঘিরে ফেলবে এবং তারপর কাউকে ওই বাড়িতে ঢুকতে বা বেরোতে দেওয়া হবে না। রেল চলাচল, সরকারি দপ্তর সবই অচল করে দেওয়া হবে।

ওই সমাবেশে জেপি তাঁর বক্তৃতায় ইন্দিরা গান্ধিকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন। তিনি ইন্দিরাকে চারদিনের মধ্যে পদত্যাগ করতে বলেন। তিনি বলেন, এরপর করদাতারা কর দেওয়া বন্ধ করবে এবং সরকারের পক্ষে কাজ চালানো অসম্ভব করে তুলবে। তিনি মিলিটারি, পুলিশ ও সরকারি কর্মচারীদের একটি ব্যর্থ সরকারের বেআইনি প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ অমান্য করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'সরকারের সাহস থাকলে তারা আমায় গ্রেফতার করুক।' তিনি জনসাধারণকে, তথ্য ও বেতারমন্ত্রী আই কে গুজরালকে ঘেরাও করতে বলেন। তিনি জনসাধারণকে 'আকাশবাণী ভবন' দখল করার আহ্বান জানান। জেপি ও মোরারজি দেশাই, ইন্দিরা গান্ধিকে ফ্যাসিস্ত ডিক্টেটর বলে সম্বোধন করেন।

মোরারজি দেশাই -- এর সাক্ষাতকার

ওই দিন রাতে মোরারজি দেশাই এক ইতালিয়ান সাংবাদিক ওরিয়ানা ফ্যালাচিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ইন্দিরা একজন দ্বিতীয় শ্রেণির নেত্রী যার ষড়যন্ত্র, দরকষাকষি, স্বজনপোষণ, ব্ল্যাকমেইলকরার শিল্পছাড়া আর কিছুই জানা নেই। ইন্দিরারনা আছে শিক্ষা,না আছে সংস্কৃতি। মোরারজি বলেন, সে একজন ফ্যাসিস্ত। মোরারজি একথাও বলেন যে ইন্দিরাকে ধন্যবাদ, তাঁকে দেখেই তিনি বুঝতে পারছেন যে কোনও মহিলার হাতে দেশ নিরাপদ নয়। মোরারজি একথাও বলেন যে তাঁদের উদ্দেশ্য বলপ্রয়োগ বা জোর করে তাঁকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা। যাতে দেশের উপকার হয়। আমরা হাজারে হাজারে গিয়ে তাঁর বাড়ি ঘেরাও করব, যাতে তিনি ঘর থেকে বেরোতে না পারেন এবং কোনও লোক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ না করতে পারেন।

অত্যন্ত কৌতূহলের বিষয় ওই সাক্ষাৎকারে মোরারজিকে যখন ইতালিয়ান সাংবাদিক ফ্যালাচি জিজ্ঞেস করেন যে তিনি ইন্দিরা গান্ধির দিক থেকে কোনও আক্রমণের আশঙ্কা করছেন কি না? তার উত্তরে মোরারজি বলেন, না না এরকম সম্ভাবনা নেই। ইন্দিরা যদি এরকম কিছু করেন তাহলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিক্রিয়া হবে। সামরিক বাহিনীর নবীন সেনাধ্যক্ষরা বিদ্রোহ করবে। বড়জোর সেনাবাহিনী প্রধান তাঁর কথা শুনতে পারেন। কেননা তাঁকে ইন্দিরা গান্ধি সম্প্রতি নিয়োগ করেছেন। যদিও বা সামরিক বাহিনী সাময়িকভাবে ইন্দিরার কথা শোনেও পরে তারা বিদ্রোহ করবে ।

জরুরী অবস্থা ঘোষণা

২৬ জুন, ১৯৭৫ মধ্যরাত্রে সংবিধানের ৩৫২ ধারায় রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আহমেদের সম্মতি নিয়ে ইন্দিরা গান্ধি অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। প্রধান বিরোধী নেতৃবৃন্দ যথা জয়প্রকাশ নারায়ণ, মোরারজি দেশাই , চরণ সিং , অটলবিহারী বাজপেয়ী , অশোক মেহতা , চন্দ্রশেখর প্রমুখ নেতৃবৃন্দসহ বিরোধী দলের অসংখ্য নেতা ও কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। লক্ষণীয় ইন্দিরা গান্ধি জরুরি অবস্থা প্রয়োগ করার জন্য সামরিক বাহিনীকে নিয়োজিত করেননি।

সাধারণ পুলিশ প্রশাসনের সহায়তায় তিনি অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা কার্যকর করেন।

তৃতীয় দুনিয়ার দেশসমূহে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নেতৃবৃন্দকে উচ্ছেদ করার জন্য দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে সমবেত করে জনবিক্ষোভ সংগঠিত করা, গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারকে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে গদিচ্যুত করা, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী নেতৃবৃন্দকে হত্যা করার যেসব ঘটনাবলি ১৯৭৩ সালে চিলিতে ও ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশে ঘটেছিল তারই পুনরাবৃত্তি ভারতেও ঘটতে চলেছিল। ইন্দিরা গান্ধি প্রতিক্রিয়ার শক্তির ওপর যে পাল্টা আঘাত করেন তা দেশকে ভয়ঙ্কর বিপদের হাত থেকে রক্ষা করে। জেপির আন্দোলনের পিছনে সমস্ত রকমের প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িক শক্তি সমর্থন জুগিয়েছিল যার মধ্যে ছিল আর.এস.এস , আনন্দ মার্গ ও জামায়েত-ই-ইসলামির মতন উগ্র ধর্মান্ধ সংগঠন। মূল সাংগঠনিক শক্তি ছিল এদের।

জরুরি অবস্থা সিপিআই ও সিপিআই (এম)

সিপিআই এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে ইন্দিরা গান্ধির পদত্যাগ দাবি করেনি। এই দলের বক্তব্য ছিল এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় ছিল উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।সুপ্রিম কোর্টে আপিলের পরিপ্রেক্ষিতে ওই উচ্চ ন্যায়ালয় হাইকোর্টের রায়ের ওপর স্থগিতাদেশ দেয়। তারপরও ইন্দিরা গান্ধির পদত্যাগের দাবিতে যে বিশৃঙ্খলা ও অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির চেষ্টা চলছিল, সামরিক বাহিনীতে অভ্যুত্থানের জন্য ডাক দেওয়া হচ্ছিল তা দেশের পক্ষে চরম বিপজ্জনক বলে সিপিআই মনে করে। তৃতীয় দুনিয়ার দেশসমূহের ক্ষেত্রে যে সাম্রাজ্যবাদী গেমপ্ল্যান তৈরি হয়েছিল জেপি'র আন্দোলন ছিল তারই ভারতীয় সংস্করণ।

জরুরি অবস্থাকে সমর্থনের ক্ষেত্রে সিপিআই দল ছিল পরিপূর্ণভাবে এক মত। ওই সময়ে দলের জাতীয় পরিষদের কোনও সদস্য জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে কোনও মত পার্টির অভ্যন্তরেও প্রকাশ করেননি। এই লেখকের মনে আছে পার্টির অন্তত দুটি জিবি মিটিংয়ে ভূপেশ গুপ্ত ও ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত (দুজনেই কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য) বলেছিলেন জরুরি অবস্থা ঘোষণা না করলে দেশে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার শক্তি প্রয়োজনে অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ক্ষমতা দখল করত।

সিপিআই-এর চেয়ারম্যান ও এ.আই.টি.ইউ.সি'র সভাপতি এস এ ডাঙ্গে ওই সময়ে ভূপালে ছিলেন। ওখানে তখন এআইটিইউসি'র সাধারণ পরিষদের অধিবেশন চলছিল। জরুরি অবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন , এই প্রথম বুর্জোয়াদের একাংশ রাষ্ট্রশক্তির নিপীড়ন যন্ত্রকে বুর্জোয়াদের চরম প্রতিক্রিয়াশীল অংশের বিরুদ্ধে সংগঠিতভাবে ব্যবহার করল। অতীতে শ্রমিক শ্রেনির বিরুদ্ধেই এই রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে। শ্রমিক শ্রেণিকে সতর্ক থাকতে হবে. এবং জরুরি অবস্থা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হলে তা প্রতিরোধ করতে হবে বলে ডাঙ্গে উল্লেখ করেন।

নির্বাচিত সরকারকে জোর করে পদত্যাগ করানোর জন্য সাম্প্রদায়িক শক্তির সাহায্যে হিংসাত্মক আন্দোলনের সঙ্গে সার্বিক বিপ্লব ও গান্ধিবাদের কী সম্পর্ক সে বিষয়ে তিনি প্রশ্ন তোলেন।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ের পর সিপিআই (এম) ইন্দিরা গান্ধির পদত্যাগ দাবি করেছিল। কিন্তু তারা সরাসরি জেপি'র আন্দোলনে যোগ দেয়নি। এমনকী তারা জেপি'র ২৫ জুনের দিল্লি সমাবেশে যোগ দেয়নি। তবে ওই সভায় দলের সাংসদ জ্যোতির্ময় বসু উপস্থিত ছিলেন। জরুরি অবস্থা ঘোষণার পর এই দল হতবিহ্বল হয়ে পড়ে। তারা মনে করে যে এক দীর্ঘস্থায়ী একনায়কতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য জরুরি অবস্থা সূত্রপাত মাত্র এবং কার্যত দেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের অবসান ঘটল। তবে জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে কোনও কার্যকর আন্দোলন গড়ার মতন আন্ডারগ্রাউন্ড সংগঠন সিপিআই(এম)-এর ছিল না। জরুরি অবস্থায় সিপিএম দলের ওপর আলাদা করে কোনও আক্রমণ ও গ্রেফতারিও চালানো হয়নি। তবে ওই সময়ে পশ্চিমবঙ্গে এই দলের সঙ্গে কংগ্রেসের তীক্ত সম্পর্ক চলতে থাকে।

অন্যান্য প্রদেশে সি.পি.আই.এম -এর দুর্বল সংগঠনের কোনও নেতা বা কর্মী গ্রেপ্তার হলেও তাঁদের অনতিবিলম্বে ছেড়ে দেওয়া হয়।

হয়তো ইন্দিরা গান্ধির সরকারও এটি প্রমাণ করার জন্য যত্নবান ছিল যে তারা দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করছে।

সিপিআই (এম) কার্যত এই সময় নিষ্ক্রিয় হয়ে ঘটনার ওপর নজর রাখছিল জ্জতাছাড়া তাদের মধ্যে জনসংঘ ও আর এস এস কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত জেপি'র আন্দোলনে যোগদান করা নিয়ে মতপার্থক্য ও বিতর্ক চলতে থাকে। জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলনেও এদের সঙ্গে যাওয়া যাবে কিনা তাই নিয়ে মতপার্থক্য দেখা দেয়। অবশেষে পার্টির সাধারণ সম্পাদক পি সুন্দরাইয়া যিনি আর এস এস ও জনসংঘের বিপদ সম্পর্কে বারবারই সতর্কবার্তা উচ্চারণ করছিলেন তিনি পার্টির সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে ইস্তফা দেন।

(চলবে)